বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ আধুনিক যুগ (১৮০১.....)

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। এই বছরটাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকেরা মধ্যযুগের সমাপ্তিচিহ্ন বলে মনে করেন। কিন্তু মধ্যযুগ শেষ হলেও সত্যিকারের আধুনিক সাহিত্যের ধারাগুলি পুষ্ট হয়ে উঠতে আরও প্রায় একশ বছর সময় লেগেছিল। এই একশ বছরের প্রথমভাগটা ছিল সব অর্থেই এক শূন্যতার যুগ। পুরনো সমাজস্থিতি ভেঙে গেছে। নতুন পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। বাঙ্গালী জীবনের সব দিকেই তখন চলছে ঘোর অরাজকতা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তখন "মীরজাফর খায় আর ঘুমোয়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্প্যাচ লেখে, বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে হাওয়া ঘুরল। শহর কলকাতায় ইংরেজের নতুন রাজধানীতে তখন কিঞ্চিৎ প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। পড়ে পাওয়া এতবড় সাম্রাজ্যটাকে শুধু ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ফেলে না রেখে যথাযথ শাসন করা দরকার একথা ভাবতে শু করেছে ইংরেজ সরকার। শাসন করতে গেলে প্রজার ভাষা রাজার জানা চাই এবং রাজার ভাষাও প্রজাকে শেখানো চাই। দ্বিতীয়টা ইতিমধ্যেই একটু আধটু শু হয়ে গিয়েছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এখন প্রথমটির জন্য সরকার উদ্যোগী হলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংরেজ রাজপুষদের বাংলা শেখাবার উদ্যোগ হল। এখান থেকে হল গদ্যের উৎপত্তি ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা।
ব্যাপারটা শুধু পারস্পরিক ভাষা শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টিতে দেশের চিত্তলোক তখন তৃষিত ও নব সংস্কৃতির জন্ম উন্মুখ হয়ে আছে। আর গ্রামে নয়, নব নির্মীয়মান কলাকাতা শহরে গড়ে উঠতে লাগল আধুনিক সভ্যতার একটি প্রাণকেন্দ্র। অচিরকালের মধ্যে এই নবজাগরণ সাহিত্যের সহস্রধারায় আত্মপ্রকাশ করল। এই সাহিত্যের আকার, প্রকার, উদ্দিষ্ট সব কিছুই পূর্ব যুগের তুলনায় এত আলাদা যে মনে হয় তা যেন নতুন সাহিত্য। পূর্বের তুলনায় এই নব সাহিত্যের প্রধান লক্ষণগুলি মোটামুটি এইরকম হল ঃ
১) মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারে বই ছাপা হতে লাগল। সাক্ষর পাঠক বই কিনে পড়তে লাগলেন। ফলে জীবিকা নির্বাহের জন্য লেখকরা আর রাজা জমিদারদের মুখাপেক্ষী রইলেন না।
২) গদ্যভাষার উৎপত্তি হল, এবং অচিরে গদ্যই হল সব রকম ভাবের বাহন।
৩) সাহিত্য ধর্মকেন্দ্রিক রইল না। মানুষের কথাই প্রধান হল।
৪) পুরনো গল্প বার বার লেখার প্রথা বিলুপ্ত হল। প্রত্যেকেই মৌলিক লেখা লিখতে চাইলেন।
৫) পাঠবিকৃতি এবং অন্যের নামে নিজের লেখা চালানোর রেওয়াজ একেবারে উঠে গেল।
৬) ইংরাজী ভাষার দরজা দিয়ে নব্যশিক্ষিতেরা সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের মর্মে প্রবেশ করলেন।
৭) একই সঙ্গে সংস্কৃত চর্চাতেও জোয়ার এল।
৮) অসংখ্য নূতন সাহিত্যশাখা দেখা দিতে লাগল।
৯) সন তারিখের গোলমাল রইল না। প্রতি রচনার ইতিহাস সুরক্ষিত হল।
১০) রচনায় উচ্চ আদর্শবাদ ও গভীর মননশীলতার সঞ্চার হল।
১১) মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল সর্বজনবোধ্য। কথকতার দ্বারা তা আপামর জনসাধারণের কাছে পৌছত। একালের সাহিত্য শিক্ষিত পাঠকের জন্য শিক্ষিত লেখকের সৃষ্টি। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতে তৈরী হল দুস্তর সাংস্কৃতিক ব্যবধান।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শাখা প্রশাখা –
আধুনিক বাংলা সাহিত্য (১৮০১.....)

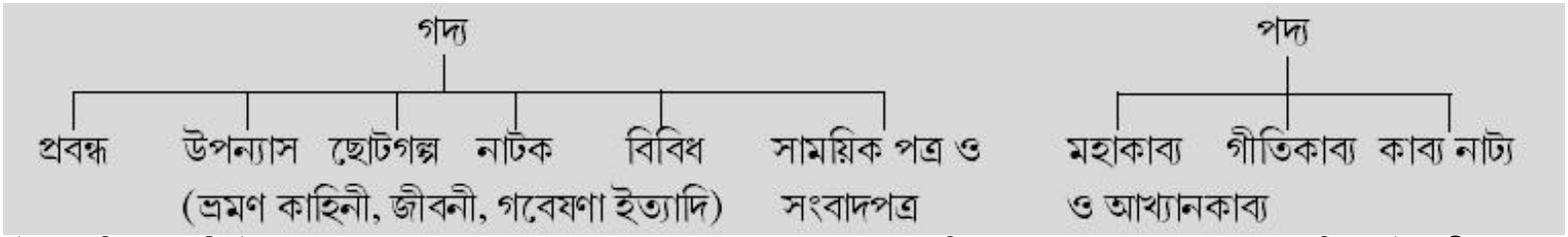

এই শাখাগুলির প্রত্যেকটিতেই এত অসংখ্য প্রকারভেদ আছে যে তা আলাদা করে দেখানো যায় না। একালের সাহিত্য পত্রপুষ্পশাখা প্রশাখা সমৃদ্ধ বৃহৎ বনষ্পতির সঙ্গেই তুলনীয়।

গদ্যভাষার সূচনা
গদ্যের উৎপত্তি - ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

বাংলা গদ্যের উৎপত্তি হয়েছিল শিক্ষাগারের পৃষ্ঠপোষকতায়। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের শিক্ষা দেবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ নামক যে প্রতিষ্ঠানটি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল সেখানে বাংলা বিভাগের প্রধান হয়ে এলেন শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়ম কেরী। এ দেশীয় ভাষা চর্চায় তাঁর মত নিবেদিতপ্রাণ মানুষ খুব কমই দেখা গেছে। কার্যভার নিয়ে কেরী তাঁর জানা শোনা পন্ডিতদের সংগ্রহ করে একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরী করলেন এবং তাঁদের দিয়ে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক লেখালেন। নিজেও লিখলেন। রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) হল বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত বাঙালী রচিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ।

পরবর্তী প্রায় দু দশক ধরে এখান থেকে অনেক পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়েছিল। বেশিরভাগই ছিল অনুবাদ। লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার।

এই পাঠ্যপুস্তকগুলির বিষয় বৈচিত্র্য থাকলেও ভাষা গৌরব বা সাহিত্যিক মূল্য খুব একটা নেই। কিন্তু মনে রাখা দরকার যেখানে পথ ছিল না সেখানে তাঁরা প্রথম পথ কাটলেন। তাদের অসম্পূর্ণ প্রয়াস সহজ করে দিল পরবর্ত্তী গদ্যস্রষ্টাদের যাত্রাপথ।

গদ্যের উৎপত্তি - রামমোহন রায়

রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) ছিলেন আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম রূপকার। ধর্ম, সমাজ ও ভাষা তিনদিকে ছিল তাঁর অনায়াস বিচরণ। প্রথম জীবনে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার পথ পরিক্রমা করে এসে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় উপস্থিত হন। বছর দুই পর থেকে তাঁর রচনাগুলি এক এক করে প্রকাশিত হতে থাকে। সাহিত্যরচনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার। কিন্তু গৌণভাবে সাহিত্যিক উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হল।

রামমোহন পাঠ্যপুস্তক লেখেন নি। প্রাপ্তবয়স্ক পরিণতবুদ্ধি মননশীল পাঠকের জন্যই তাঁর রচনা। এর মধ্যে আছে-
১) ধর্মতত্ব ও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ - বেদান্তগ্রন্থ ও বেদান্তসার, ঈশোপনিষৎ মুন্ডকোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ, মান্ডুক্যোপনিষৎ ইত্যাদি।
২) বিতর্কমূলক রচনা - ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, কবিতাকারের সহিত বিচার, সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ ইত্যাদি।
৩) বিবিধ - গৌড়ীয় ব্যাকরণ, ব্রহ্মসংগীত ইত্যাদি।
৪) সাময়িক পত্র -- ব্রাহ্মণ সেবধি, সম্বাদ কৌমুদী।
এইসব দুরূহ আলোচনার দ্বারা তিনি নবজাত গদ্যভাষাকে শক্তিশালী করলেন।

গদ্যের উৎপত্তি - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) বহুমুখী কর্মধারা ও বিচিত্র ব্যক্তিত্বের মাত্র একটি দিক তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। রামমোহনের মত তিনিও সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে কলম ধরেন নি। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমাজসংস্কার ও শিক্ষা বিস্তার, গৌণতঃ সাহিত্য রচনা। কিন্তু কার্যতঃতাঁর হাতেই প্রথম বাংলা গদ্য পরিণত শিল্প সুষমা লাভ করল এবং নবযুগের সর্বভাবপ্রকাশক্ষম শক্তিশালী ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করল। তাঁর রচনাবলী মোটামুটি নিম্নলিখিত প্রকার।
১) অনুবাদ। বিদ্যাসাগরের অনুবাদগুলি আক্ষরিক অনুবাদ নয়। ভাবানুবাদ, এক হিসাবে মূল অবলম্বনে নূতন রচনা।
ক) সংস্কৃত থেকে অনুবাদ -- শকুন্তলা, সীতার বনবাস
খ) ইংরাজী থেকে অনুবাদ -- ভ্রান্তিবিলাস, বাঙ্গলার ইতিহাস, জীবনচরিত, বোধোদয়, কথামালা ইত্যাদি
গ) হিন্দি থেকে অনুবাদ -- বেতাল পঞ্চবিংশতি।
২) মৌলিক রচনা -- বিধবাবিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার, অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল, স্বরচিত জীবনবৃত্তান্ত, প্রভাবতী সম্ভাষণ।
৩) পাঠ্যপুস্তক -- বর্ণপরিচয় (১ম ও ২য়), উপক্রমণিকা ইত্যাদি। বিদ্যাসাগরে পৌঁছে বাংলা গদ্যভাষা এতদিনে সরসতা অর্জন করল। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি স্মরণীয় -- "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজগতি ও কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন -- এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন।"

বাংলা সাময়িক পত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।।

শিক্ষাবিস্তার থেকে আসে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতনতা, এবং সেই সচেতনতা থেকেই জন্মলাভ করে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে সেইভাবেই সাময়িক পত্রের উদ্ভব হয়েছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পর থেকে সেই স্রোত আজ পর্যন্ত বহমান আছে। একেবারে প্রথম যুগের প্রধান বাংলা পত্রিকাগুলি হল--
১) সমাচার দর্পন - ১৮১৮ খৃঃ - শ্রীরামপুর মিশন সম্পাদিত
২) সম্বাদ কৌমুদী - ১৮২১ খৃঃ - রামমোহন রায় সম্পাদিত
৩) সমাচার চন্দ্রিকা - ১৮২২ খৃঃ - ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
৪) সংবাদ প্রভাকর - ১৮৩১ খৃঃ- ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত
৫) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা - ১৮৪৩ খৃঃ - অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত
আজকের পত্রপত্রিকার সঙ্গে কোনোভাবেই এদের তুলনা চলে না। এগুলি ছিল ক্ষুদ্রকায়, অনিয়মিত। আন্তর্জাতিক সংবাদ বা ভাবধারার সঙ্গে এদের যোগ থাকত না। স্থানীয় কিছু চুটকি খবর আর মালিক ও তদীয় গোষ্ঠীর ধর্ম ও সমাজসম্পর্কিত মতামতের মুখপত্র হওয়াই ছিল এগুলির প্রধান লক্ষ্য। তবুও ভাষানির্মাণে এদের ভূমিকা তুচ্ছ নয়। একটা জাতির নবজাগরণের কালে লঘুগু নানা রকমের ভাবনাচিন্তা, তর্কাতর্কি ও রঙ্গব্যঙ্গে এগুলি মুখর থাকত।

এইভাবেই কেটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। এই যুগ ভাষা গঠনের যুগ। নানা উৎস থেকে ভাবকল্পনা আহরণের যুগ। দ্বিতীয়ার্ধে এল আহৃত উপকরণ ব্যবহার করবার সময়। অসংখ্য সাহিত্য শাখায় মৌলিক রচনার সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক পত্রের রাজ্যেও এল এক বিস্ফোরণ। পরবর্তীকালে এত পত্রপত্রিকা বেরিয়েছিল যে তাদের প্রধানগুলির বিবরণ দিতে গেলেও আলাদা পুস্তকের প্রয়োজন হবে। তাই এই পরবর্তী অধ্যায়ে শুধু পত্রিকার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান প্রবণতাগুলির পরিচয়ই দেওয়া যাক।

ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত সাময়িক পত্র।।

বাণিজ্যসফল সর্ববহ পত্র পত্রিকাগুলি সাধারণতঃ জনাসাধরণের গড়পড়তা চি অনুসারেই চলে। অথচ মহৎ প্রতিভার যাঁরা অধিকারী তাঁরা সব সময়েই নূতন পথে চলতে চান। সেইজন্য মাঝে মাঝে দেখা যায় এইরকম প্রতিভা যাঁদের আছে সুযোগ পেলে নিজেদের আত্মপ্রকাশের উপযোগী পত্রিকাও তাঁরা তৈরী করে নেন। বাংলা সাহিত্যে এইরকম অতিপ্রত্যক্ষ উদাহরণ আছে।
১) বঙ্গদর্শন (১৮৭২) - এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনেক উৎকৃষ্ট রচনার প্রথম প্রকাশও এখানে। শুধু নিজের লেখা নয় একটি উন্নতমানের লেখকগোষ্ঠীও তিনি এখানে তৈরী করেছিলেন।
২) সাধনা - এটি ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখপত্র। ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে তাঁর জীবনের অত্যুৎকৃষ্ট লেখাগুলি এখানেই প্রথম আলোর মুখ দেখে। বিশেষ করে এই পত্রিকাটি না থাকলে হয়ত গল্পগুচ্ছের নিটোল গল্পগুলি লেখাই হত না।
৩) সবুজপত্র (১৯১৪) - প্রথম চৌধুরীর সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে এই পত্রিকা ওতপ্রতভাবে জড়িত। মৌলিকতার সাধনা ছিল সবুজপত্রের অন্যিষ্ট। ভাষায় ও ভাবে দু দিক দিয়েই সম্পাদক তাঁর

৩) সবুজপত্র (১৯১৪) - প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে এই পত্রিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মৌলিকতার সাধনা ছিল সবুজপত্রের আবিষ্ট। ভাষায় ও ভাবে দু দিক দিয়েই সম্পাদক তার সে উদ্দেশ্য সফল করেছিলেন। চলিত ভাষায় লেখাকে একটা আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন তিনি এবং এই পত্রিকার প্রভাবে সেই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথকেও তিনি সামিল করেছিলেন।

উন্নতমানের সর্ববহ মাসিকপত্র।।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে তিনটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যপত্র সে কালের সমস্ত বড় লেখকের প্রথম প্রকাশের জায়গা হয়ে উঠেছিল তারা হল
১) প্রবাসী - রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
২) ভারতবর্ষ - দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পরিকল্পিত।
৩) বিচিত্রা - উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত।
এগুলি বাণিজ্যসফল বড় পত্রিকা। তবু কৃতী সম্পাদকেরা তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিবলে নতুন প্রতিভা চিনতে পারতেন এবং সাগ্রহে ও সাদরে তাদের গ্রহণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রভৃতি খ্যাতনামারা যেমন এখানে ছিলেন তেমনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, অন্নদাশংকর রায় এই পত্রিকাগুলির আশ্রয় পেয়ে লাভবান হয়েছিলেন।

গোষ্ঠীচিহিত সাহিত্যপত্র।।

১) কল্লোল, কালিকলম প্রগতি এগুলি ছিল ভিন্ন এক ধারার পত্রিকা। এক হিসাবে এদের আধুনিক লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পূর্বসুরী বলা যেতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিভ্রান্তি ও মূল্যবোধের সংকট পাশ্চাত্যে নতুন লেখকদের মধ্যে যে আলোড়ন এনেছিল তার ঢেউ আমাদের দেশেও পৌঁছয়। এই নতুন ভাবধারায় প্রাণিত হল অনেক লেখক, কার্ল মার্কস ও ফ্রয়েডের চিন্তাধারায় পুষ্ট হয়ে জীবনের অজানা অনেক অন্ধকার সম্বন্ধেও কেউ কেউ সচেতন হয়ে ওঠেন। প্রচলিত ব্যবসায়িক পত্রিকার বাইরে এঁরা নিজেদের একটা মুখপত্র চেয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের একটা যুগের ফেনোচ্ছল বিক্ষোভ এই পত্রিকাগুলিতে ধরা আছে।
২) পরিচয় - কল্লোলের বিক্ষোভের পরে একটা স্থিতিশীল বৈদগ্ধ্য ও মননশীলতার তাগিদ যাঁরা অনুভব করেছিলেন পরিচয় ছিল তাঁদের মেলবার জায়গা। এর সম্পাদক ছিলেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।
৩) কবিতা - সাহিত্য পত্রিকায় গদ্যেরই জয়জয়কার। কবিতার স্থান হয় পাদপূরণে। এই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথ দেখিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। কবিতা পত্রিকা তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। প্রধানতঃ কবিতা এবং কবিতারই বিষয়ে কিছু আলোচনা এই ছিল পত্রিকার বিষয়। কালের দিক দিয়ে রবীন্দ্রপরবর্তী ও ভাবের দিক দিয়ে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত যে গোষ্ঠীকে আমরা আধুনিক কবি বলে জানি কবিতা ছিল তাঁদেরই আপন আশ্রয়।

বর্তমান অবস্থা ।।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত পত্রপত্রিকার রাজ্যে ব্যক্তিচিহিত বা গোষ্ঠীচিহিত সেরকম কোনও স্মরণযোগ্য উদাহরণ দেখা গেল না। অথচ বাংলা সাহিত্যের উন্নতি থেমে নেই। কয়েকটি শাখায়, বিশেষতঃ উপন্যাসে তার অগ্রগতি বিস্ময়কর। দৈনিক সংবাদপত্রের শাখাটিও প্রভূত উন্নতি করেছে। কিন্তু উন্নতমানের সাহিত্যপত্র যেগুলি ছিল সেগুলি অধিকাংশই আজ লুপ্ত অথবা মানহীন। ষাট বছরের অধিককাল পার করে এখনও সগৌরবে ‘দেশ’ পত্রিকা বিরাজ করছে বটে, এখনও সেখানে দেশের অগ্রণী লেখক কুল এবং নবীন প্রতিভা দুটি শ্রেণীই আশ্রয় পাচ্ছেন বটে, তবু এই পত্রিকার দেহেও জরার চিহ্ন দেখা দিয়েছে, একথা মিথ্যা নয়। পঞ্চাশ বছরের ওপর যা ছিল সাপ্তাহিক তা হয়ে যাচ্ছে পাক্ষিক। এদিকে প্রতিনিয়ত অসংখ্য পত্রপত্রিকা বেরোচ্ছে যাদের কারও বিষয় গৃহসজ্জা, কারও স্বাস্থ্য, কারও বা খেলা বা সিনেমা। শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যে কিছু পত্রিকা আছে। তাদের কোন কোনটির চাকচিক্য ও জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর। মনে হয় একালে সিরিয়াস বিষয় নিয়ে পড়বার ও ভাববার লোক কমে গেছে। তাই লঘু চিন্তার পসরা যাচ্ছে বেড়ে। ব্যবসায়িক জগতের বাইরে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিয়ত অসংখ্য লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন অবশ্য বেরোয়। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষণজীবী। যারা টিঁকে আছে তাদের মধ্যে ভালোমন্দ মাঝারির শ্রেণীবিভাগ দুস্তর। আপাততঃ এইরকম একটি অস্থির অবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলা সাময়িকপত্র বেঁচে আছে।

কথাসাহিত্য

বাংলা উপন্যাস ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আজকের দিনে সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যশাখা কোন্‌টি যদি কেউ ও প্রশ্ন করেন তবে নিঃসন্দেহে তার উত্তর হবে - উপন্যাস। অতীতকালে মহাকাব্যের মধ্যে যে বৈচিত্র্য ছিল, এবং জাতির জীবন এর মধ্যে যেভাবে প্রতিফলিত হত আজকের দিনে এর উত্তরাধিকার পাই উপন্যাসে। বাংলা উপন্যাসও উৎকর্ষ, বৈচিত্র্য এবং পরিমাণ সব দিকে যে পরিমাণে উন্নতি করেছে তা বিস্ময়কর।
বাংলা উপন্যাসের উৎপত্তি হল বঙ্কিচন্দ্রের হাতে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনী থেকে এই শাখার সূচনা। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৬) শুধু ঔপন্যাসিক ছিলেন না, ছিলেন একজন মস্ত বড় চিন্তানায়ক, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নবজাগরণের এক স্থপতি। তাঁর সমকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে জীবন সম্পর্কে যে সব জিজ্ঞাসা এবং পরাধীন স্বদেশ সম্পর্কে যে সব বেদনা ও আবেগ জেগে উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীতে তা ভাষা পেয়েছে।
নাতিদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে ছোটবড় মিশিয়ে তিনি চৌদ্দটি উপন্যাস লেখেন। সেগুলি হল --
দুর্গেশনন্দিনী - ১৮৬৫
কপালকুণ্ডলা - ১৮৬৬
মৃণালিনী - ১৮৬৯
বিষবৃক্ষ - ১৮৭৩
ইন্দিরা - ১৮৭৪
যুগলাঙ্গুরীয়- ১৮৭৪
চন্দ্রশেখর - ১৮৭৫
রাধারাণী - ১৮৭৫
রজনী - ১৮৭৭
কৃষ্ণকান্তের উইল - ১৮৭৮
রাজসিংহ - ১৮৮২

আনন্দমঠ- ১৮৮২
দেবীচৌধুরাণী - ১৮৮৪
সীতারাম - ১৮৮৭

এর মধ্যে বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ও রজনী সামাজিক উপন্যাস, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী বড় আকারের গল্প ও লঘু রচনা, বাকিগুলি ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স। রোমান্সগুলিতে তিনি ভারত ইতিহাসের কোন না কোন যুগ সন্ধিকালকে পটভূমি স্বরূপ ব্যবহার করেছেন। যেমন বাংলায় যখন পাঠান শক্তির অবসানে মোগলের অভ্যুদয় হচ্ছে সেটা দুর্গেশনন্দিনীর প্রেক্ষিতে রয়েছে। হিন্দু যুগের অবসান এবং তুর্কী বিজয় মৃণালিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষভাগে যখন মোগল সাম্রাজ্য ভিতরের দ্বন্দ্বে বাইরের বিদ্রোহে অন্তঃসারশূণ্য হবার মুখে তখনকার কাহিনী হল রাজসিংহ। বাংলায় মুসলমান শাসন শেষ হচ্ছে উদয় হচ্ছে ইংরেজের এই প্রেক্ষিত ব্যবহৃত হয়েছে চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীতে। ইতিহাসের অনুরাগী পাঠক বঙ্কিম বুঝেছিলেন রাজা বদলের সময়গুলিতেই সমাজের পুরনো সুস্থিতি ভেঙে জীবন হয়ে ওঠে অনিশ্চিত ও প্রাণচঞ্চল। গ্রামের সামান্য মানুষ অবস্থাগতিকে তার ছায়াশীতল গৃহকোণ ছেড়ে ইতিহাসের তপ্ত রাজপথে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। এই কৌশলে বঙ্কিম তাঁর রচনায় 'ইতিহাসের বৃহৎ ঘটনার সঙ্গে মানবজীবনের ছোট ছোট সুখ দুঃখগুলিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এরই সঙ্গে সেখানে সঞ্চার করেছেন দেশপ্রেম ও উচ্চ আদর্শবাদ।

তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলি সমকালীন গ্রামীণ অভিজাতের জীবন অবলম্বনে লেখা। নায়কেরা শিক্ষিত, আধুনিক চি ও মূল্যবোধের অধিকারী। নায়িকারা অন্তঃ পুরিকা বটে কিন্তু তারাও স্ব াধীন ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো উপন্যাসেই প্রধান চরিত্রেরা সাধারণ মানুষ নয়, জনসাধারণ তখনও বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করে নি। এরা সকলেই বড় মাপের ম ানুষ। দোষেগুণে প্রেমে বীর্যে বৃহৎ। এই সব অসাধারণ মানুষের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম মানব জীবনে নিয়তির একটা লীলা দেখাতে চেয়েছেন। মানুষের অন্তর্জগতে দেখেছেন ধর্মাধর্মের নিত্য সংগ্র াম। মহৎ চিত্তেও কখনো কখনো দমকা হাওয়ার মত হঠাৎ আসে প্রবৃত্তি বেগ। অধিকাংশ সময়েই তা আসে রমনীরূপমোহের আকার নিয়ে। জীবনের সযত্ন রচিত পুরনো প্যাটার্ণ ভেঙে যায়। নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে মর্মান্তিকরূপে সচেতন এই সব ট্রাজিক নায়কদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তিনি বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। সেটাই তাঁর উপন্যাসগুলির মৌল জীবন বোধ।

উপন্যাস ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।।

সাহিত্যজগতে দু রকমের লেখক আসেন, একদল ইতিহাস সৃষ্টি করেন, অপরদল তার প্রবাহ রক্ষা করেন। বঙ্কিমের পরে প্রবাহ রক্ষাকারী যে লেখককুল দলে দলে দেখা দিলেন তাঁদের অনেকেরই প্রতিভার অভাব ছিল না। তাঁদের রচনাগুলি অবশ্যই স্মরণীয়। তবে বর্তমান সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে তাঁদের আলোচনা সম্ভব নয় বলে আমরা চলে যাই বঙ্কিমের পরবর্তী মাইলস্টোনের ক াছে। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১)।
রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক এবং আধুনিক বাঙ্গালী সংস্কৃতির নির্মাতা। কাব্য, নাটক, গান, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ নিবন্ধ সাহিত্যের সব শাখাই রবি করে উদ্ভা সিত হয়েছিল। আপাততঃ উপন্যাস প্রসঙ্গে আসি।
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে কাল ও ভাবের দিক দিয়ে সুস্পষ্ট তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।
১) আদিপর্ব
বৌঠাকুরাণীর হাট ১৮৮৫
রাজর্ষি ১৮৮৭

২) মধ্যপর্ব
চোখের বালি ১৯০৩
নৌকাডুবি ১৯০৬
গোরা ১৯১০

৩) অন্ত্যপর্ব
ঘরে বাইরে ১৯১৬
চতুরঙ্গ ১৯১৬
যোগাযোগ ১৯২৯
শেষের কবিতা ১৯২৯
দুই বোন ১৯৩৩
মালঞ্চ ১৯৩৪
চার অধ্যায় ১৯৩৪

আদিপর্বের উপন্যাসদুটিতে রবীন্দ্র প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। তখনও তিনি অনভিজ্ঞ। নিজের পথ তখনও খুঁজে পান নি বলে প্রচলিত ঐতিহ্যের অনুসরণে রোমান্সধর্মী লেখা লিখেছিলেন। কিন্তু মধ্যপর্বে এসে তিনি তাঁর পূর্ণ শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর গল্প উপন্যাস ঘটনাপ্রধান নয়, অন্তর্মুখী। এখন থেকে সেটাই শু হল। পরবর্তী কালে উপন্যাসের এই নবপদ্ধতির উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেকথা বলে গেছেন।— "সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।"

মধ্যপর্বের তিনটিই সামাজিক উপন্যাস। প্রধান পাত্রপাত্রীরা সকলেই শহরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মানুষ। নরনারীর প্রেমের সূক্ষ্ম
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তিনটি উপন্যাসেই পাওয়া যায়। কেবল গোরাতে তার সঙ্গে একটি নূতন মাত্রা যুক্ত হয়েছে - দেশের ও ধর্মের স্বরূপ সন্ধানের একটি দার্শনিক মাত্রা।

অন্ত্যপর্বের উপন্যাসে বিষয় ও আঙ্গিক দুটিই অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। ঘরে বাইরে ও চার অধ্যায় রাজনৈতিক উপন্যাস। দেশের নামে হিংসাত্মক আন্দোলন ও দলের কাছে বিবেকের বলিদান র াজনীতির অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই ও রাজনীতি সমর্থন করতেন না। দেশসেবা সম্বন্ধে তাঁর সুনির্দিষ্ট গঠনমূলক মতামত ও কর্মপন্থা ছিল যা প্রচলিত জনমতের বিপরীত। তাঁর সেই নিজস্ব মতামত ঐ দুটি উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে। শেষের কবিতা, দুই বোন ও মালঞ্চে আছে নরনারী প্রেমের নানা স্তরের কথা। চতুরঙ্গ দার্শনিক উপন্যাস। ক্রমান্বয়ে যুক্তির পথে, ভক্তির পথে এবং শেষে ধ্যান ও আত্মানুসন্ধানের পথে নায়ক এখানে তার জীবনের অনিষ্টকে খুঁজে বেড়িয়েছে। যোগাযোগে প্রতিফলিত হয়েছে আধুনিক জগতের অসম দাম্পত্যের সমস্যা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যেখানে বাইরের কোনো বাধা নেই, সেখানেও স্বভাবের গভীরে থাকতে পারে দুস্তর ব্যবধান এবং থাকলে তার পীড়ন কোথায় কতখানি হয়ে বাজে এখানে তা তিনি দেখিয়েছেন।

এইসব উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর যুগের থেকেও এক পা এগিয়ে গিয়েছেন বলে মনে হয়। আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও অনেক নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা এই পর্বে হয়েছে। দুইবোন, মালঞ্চ ও চারঅধ্যায়ের অনেকখানি নাটকের মত সংলাপভিত্তিক ঘরে বাইরে প্রধান পাত্রপাত্রীদের আত্মকথনের ভঙ্গীতে লেখা। চতুরঙ্গে এসেছে চারটি ভিন্ন দৃষ্টিকোন। প্রায় সবগুলিতেই ভাষা আপাতদৃষ্টিতে চলিত হলেও অলংকৃত, তির্যক ও ব্যঞ্জনাময়।

ছোটগল্প ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।।

উপন্যাস ও ছোটগল্প দুটির ভিত্তিই মানবজীবন। তফাত এই যে উপন্যাসে থাকে জীবনের সমগ্র রূপ এবং ছোটগল্পে থাকে তার কোনো তাৎপর্যময় খন্ডাংশ। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ধারাটি খুবই সমৃদ্ধ। এ ধারার উৎপত্তি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বছর ত্রিশ সেইসময় ঠাকুর পরিবারের এজমালি জমিদারি দেখাশোনার ভার নিয়ে তিনি পূর্ববঙ্গে যান ও সেখানে প্রায় বছর দশেক থাকেন। সেখানে পৌঁছে নতুন পরিবেশের প্রভাবে তাঁর মনের মধ্যে একটা বন্ধ দরজা যেন খুলে যায়। শহরের যে জীবনে তিনি এতকাল অভ্যস্ত ছিলেন তার সঙ্গে পদ্মাতীরবর্তী এই গন্ডগ্রামগুলির মানুষ ও প্রকৃতির কী দুস্তর ব্যবধান। প্রকৃতি এখানে বিপুল, জীবন এখানে শান্ত। দীন দরিদ্র সরল মানুষ, উচ্চাকাঙ্খাহীন গৃহবাসী মধ্যবিত্ত মানুষ, যত তুচ্ছই হোক প্রতি মানুষই তাঁকে এক একটা না লেখা গল্পের মত আকর্ষণ করতে লাগল। মানবজীবনের অনন্ত বৈচিত্র্যের ছোট ছোট তরঙ্গগুলিতে পর্যবেক্ষণ করা ও ফুটিয়ে তোলা এই পর্বে একটা নেশার মতে তাঁকে পেয়ে বসেছিল। 'ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত গল্প লিখি একেকটি করে' এ ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করেছিলেন স্বসম্পাদিত সাধনা পত্রিকায় প্রতি সংখ্যায় ছোটগল্প লিখে। এই পর্বের গল্পগুলি গল্পগুচ্ছ ১ম ও ২য় খন্ডে সংকলিত আছে। পদ্মাতীরের বাসে উঠার বেশ কয়েকবছর পরে প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রে আবার তাঁর নবপর্যায়ের ছোটগল্পগুলি দেখা দিল। এগুলি গল্পগুচ্ছ ৩য় খন্ডে আছে। এগুলির ভাষা চলিত, গতি তীব্র, দৃষ্টিভঙ্গীতে আছে সমাজ সমালোচনার ঈষৎ বিদ্রুপদিপ্ধ তির্যক আভাস। এগুলির স্বাদ প্রথম যুগের তুলনায় কিছু আলাদা।

এই তিন খন্ডে বিধৃত ছোটগল্পে বাংলা ছোটগল্পকে রবীন্দ্রনাথ বিমানে পৌঁছে দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা থেকে একাংশ উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাবে – "সারা বাংলাদেশটাকে পাওযা যায় এখানে। যে বাংলাদেশ শুধু বাস্তবই নয়, জীবন্ত তারই হৃৎস্পন্দন আমরা এর পাতায় পাতায় শুনতে পাই। তার ঋতুবৈচিত্র্য তার প্রাণপ্রতিম নদীস্রোত, তার প্রান্তর বাঁশবন, চন্ডীমন্ডপ, রথতলা, তার স্নিগ্ধ আর্দ্র ঘন উদ্ভিজ্জ গন্ধ, তার দুরন্ত কলোচ্ছাসিত পল্লীপ্রাণ বালক বালিকা, সেবানিপুণা কল্যাণী বুদ্ধিমতী গৃহিণী, নধর গোলগাল পরিতৃপ্ত, পান তামাক আড়ায় আসক্ত ভালোমানুষ পুষ, প্রাচীন যুগের ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত, নবীন যুগের কর্মঠ ব্যবসায়ী। প্রথম স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সামাজিক বিপ্লব, শেষ উনিশ ও প্রথম বিশ শতকের আধুনিকতা - সব ধরা পড়েছে গল্পগুচ্ছে। আছে বালিকা বধূর নিঃশব্দ দুঃসহ বেদনা। আছে আত্মবশ আধুনিকার দীপ্ত মূর্তি। মনে হয় যেন এই গল্পগুলির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশই কথা কয়ে উঠেছে বার বার।"

উপন্যাস ঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।।

শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮) বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। হুগলী জেলার গন্ডগ্রামে দরিদ্রঘরে তাঁর জন্ম, ভাগলপুরে মাতুলালয়ের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে তাঁর বাল্যজীবন ও শিক্ষাদীক্ষা, রেঙ্গুনে প্রবাসে একাকী কর্মজীবনের শু – এই বিস্তৃত পরিধিতে তিনি অনেক রকম অবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন এবং অনেক রকম মানুষ দেখেছিলেন। পাড়াগাঁয়ে গরিব ঘরের ছেলে হয়ে জন্মানোর ফলে তৎকালীন গ্রাম সমাজের অশিক্ষা, কুসংস্কার ও শোষণের প্রহার তাঁকে ভালোভাবেই সইতে হয়েছিল। আবার পরবর্তী শিক্ষাদীক্ষা ও বৃহত্তর জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে উদার সংস্কারমূক্ত করেছিল। এইভাবে তাঁর মনোজীবন গঠিত হয়েছিল বলে পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্য দুটি জিনিস বার বার দেখা দিয়েছে। এক-গ্রামসমাজের অতিপ্রত্যক্ষ বাস্তব চিত্র এবং দুই - ক্লিন্ন পরিবেশের মধ্যেও মানুষের অবিনাশী চরিত্রমহিমা। মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসাই তাঁর রচনার সবচেয়ে বড় আকর্ষণী শক্তি।
১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বড়দিদি নামক একটা বড় গল্প নিয়ে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পরবর্তী পঁচিশ বছর ধরে মাত্র দুটি ছোটগল্প এবং সামান্য কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধ ছাড়া তিনি শুধুমাত্র উপন্যাসই লিখেছেন। তাঁর প্রধান রচনাগুলি হল –
১৯১৩ - বড়দিদি
১৯১৪ - বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, পরিণীতা।
১৯১৬ - পল্লীসমাজ, চন্দ্রনাথ, বৈকুন্ঠের উইল, অরক্ষনীয়া।
১৯১৭ - শ্রীকান্ত (১ম), দেবদাস, চরিত্রহীন,
১৯১৮ - শ্রীকান্ত (২য়), দত্তা।
১৯২০ - গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে
১৯২৩ - দেনা পাওনা
১৯২৪ - নববিধান
১৯২৬ - পথের দাবি
১৯২৭ - শ্রীকান্ত (৩য়)
১৯৩১ - শেষ প্রশ্ন
১৯৩৩ - শ্রীকান্ত (৪র্থ)
১৯৩৫ - বিপ্রদাস
তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম বয়সের রচনা শুভদা ও শেষ উপন্যাস শেষের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছিল।

শরৎ রচনায় নারীরই প্রাধান্য। পুষেরা অধিকাংশই অলস, কর্মভী, উদাসীন, বিষয়বুদ্ধিশূন্য, কেউ নেশাখোর, কেউ চরিত্রহীন, কেউ ভাবাবেগে ভেসে যাওয়া রোমান্টিক। নারীরা শক্তিময়ী, প্রেমময়ী, আত্মত্যাগপরায়ণা। নিজ প্রেমের শক্তিতে তারা এইসব পুষদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তাদের হৃদয়ে আজন্মার্জিত সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হৃদয়বৃত্তির দ্বন্ব হয়, কিন্তু পরিণামে জয় হয় হৃদয়বৃত্তিরই। নারীর প্রেমকে লেখক নানা পরিস্থিতিতে ফেলে দেখিয়েছেন। কেউ বা একান্তবর্তী পরিবারের গৃহলক্ষ্মী হয়ে পরের ছেলেকে মাতৃবৎ স্নেহে পালন করে, কেউ পতিতা, কেউ একবারের স্খলনের জন্য সারাজীবন প্রায়শ্চিত্ত করে, কেউ সন্ন্যাসিনী, কেউ প্রতিহত প্রেমের জ্বালায় কুলত্যাগিনী। কিন্তু যার হৃদয়ে প্রেম আছে লেখকের কাছ থেকে সে আদায় করেছে গভীর সমবেদনা ও সমর্থন। হৃদয়াবেগই শরৎ উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং লেখক নিজেও হৃদয়াবেগের দৃষ্টিতেই জগৎকে দেখেন।
এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের গল্প বলবার অসাধারণ দক্ষতা। কৌশলবর্জিত অনায়াস তাঁর ভাষার প্রবাহ। এই প্রবাহ চোরা স্রোতের মত উদাসীন পাঠককেও গল্পের কেন্দ্রে টেনে নিয়ে যায়। শেষ না করা পর্যন্ত তার উঠে আসার ক্ষমতা থাকে না।
যে সমাজপরিবেশ নিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর গল্পগুলি লিখেছিলেন আজ তা পালটে গেছে। আধুনিক বিচারে তাঁর রচনার মধ্যে নানা প্রকার অসঙ্গতিও চোখে পড়ে। তবুও তাঁর সৃষ্ট নরনারীদের আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কী যাদুকরী শক্তি ছিল তাঁর কলমের কে জানে। আজও, তাঁর সমালোচনা করতে করতেও, আমরা তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে না ভালোবেসে পারি না। আজও শরৎচন্দ্র সমান জনপ্রিয়।

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাস শাখার প্রথম যুগের তিন দিকপাল। এঁদের প্রদর্শিত পথে অগণিত লেখক তৈরী হয়েছিলেন। নতুনতর পরীক্ষা নিরীক্ষাও শু হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ যখন শেষ হচ্ছে, বাংলা কথাসাহিত্যের জগৎ বহুনক্ষত্রখচিত। তার মধ্য থেকে প্রধান তিনজনকে আলাদা করে দেখানো যাক।

উপন্যাস ও ছোটগল্প ঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।।

ইছামতী তীরবর্তী বারাকপুর গ্রামে দরিদ্র পরিবারে বিভূতিভূষণ (১৮৯৪-১৯৫০) জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে, এবং বহু শোক সহ্য করতে করতে তিনি বড় হয়েছেন। এই সব অভিজ্ঞতা তাঁর মনকে তিক্ত করে নি, বরং জীবন সম্বন্ধে একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও ক্ষমাসুন্দর ভালোবাসা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিল। তাঁর রচনায় তাই এমন একটা দুর্লভ প্রশান্তির স্পর্শ আছে যা তাপদগ্ধ আধুনিক মানুষের মনের জ্বালা জুড়িয়ে দেয়। ভাগলপুরে জঙ্গল মহালে ম্যানেজারের কাজ করতে করতে তিনি তাঁর শৈশবস্মৃতি অবলম্বনে পথের পাঁচালি লিখতে শু করেন এবং বিচিত্রায় তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিপূর্বে দু একটি ছোটগল্প ছাড়া কিছু তিনি লেখেন নি। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁকে কেউ চিনত না। কিন্তু ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে পথের পাঁচালি প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের গতিপথ সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল।
এর পর থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত তিনি অনেক উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস চারটি --
পথের পাঁচালি - ১৯২৯
অপরাজিত - ১৯৩২
আরণ্যক - ১৯৩৮
ইছামতী - ১৯৫০

ছোটগল্প সংকনের মদ্যে মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরীফুল (১৯৩২), যাত্রাবদল (১৯৪১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তাঁর শেষ্ঠ গল্পগুলি নিয়ে নানারকম সংকলনও আছে।
এখানে ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বোধহয় বলা যেতে পারে। তা এই যে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের দৌলতে পথের পাঁচালি সম্বন্ধে যে ধারণা বাইরের জগতে গড়ে উঠেছে প্রকৃত পথের পাঁচালি তা নয়। তাছাড়া পথের পাঁচালি কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ বইও নয়। পথের পাঁচালি ও অপরাজিত এই দুই গ্রন্থ একসঙ্গে নিয়ে অপূর জীবনবৃত্তান্ত পূর্ণতা পেয়েছে। গ্রামের স্নেহচ্ছায়া ছেড়ে পরবর্তী জীবনে নানা আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে গিয়েও অপু অপরাজিত। কোনো দুঃখ দৈন্য তার আত্মাকে নষ্ট করতে পারেনি। কোন রক্ষাকবচ সে আপন অন্তরে পেয়েছিল তারই ইতিহাস আছে এ দুই উপন্যাসে।

বিভূতিভূষণের ছোটোগল্পগুলি সরল ও নিটোল। দু-চারটি ঐতিহাসিক বা রূপকধর্মী রচনা থাকলেও অধিকাংশই গ্রামদেশের সাধারণ মানুষের হৃদয়স্পর্শী কাহিনী।

উপন্যাস ও ছোটগল্প ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।।

বীরভূম জেলার লাভপূর গ্রামে এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবংশে তারাশঙ্করের (১৮৯৮-১৯৭১) জন্ম হয়। অল্প বয়সেই সমাজসেবার কাজের মধ্য দিয়ে স্বদেশের নানা শ্রেণীর সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের সাধনা তিনি সারাজীবন করেছেন। ভদ্র বা পরিচিত জনগোষ্ঠীর বাইরে এত নানা রকমের বৃত্তিধারী অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের কথা এবং তাদের জীবনযাত্রার বাইরের চেহারা ও ভেতরের সুখদুঃখের ধরণগুলি তারাশঙ্করের মত করে বাংলাসাহিত্যে আর কেউ দেখাতে পারেন নি। আগে নয় পরেও নয়। তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল সমাজবিশ্লেষণে। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় পুরনো সামন্ততান্ত্রিক শক্তির বদলে নতুন বণিকশক্তির কিভাবে উদয় হচ্ছে। একালের অর্থনীতি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন এবং অভ্রান্ত নৈপুণ্যে ব্যাখ্যা করেছেন। ইতিপূর্বে শরৎচন্দেরর উপন্যাসে পল্লীসমাজের ছবি পাওয়া গেছে। কিন্তু তার বেশী গভীরে তিনি প্রবেশ করেন নি। তারাশঙ্কর পল্লীসমাজের অবক্ষয়ের পেছনে অর্থনৈতিক সমাজনৈতিক যে কার্যকারণপরম্পরা ছিল তা সঠিকভাবে দেখিয়েছেন। এই দুই বৈশিষ্ট্যে তারাশঙ্কর বাংলা কথাসাহিত্যের এক স্মরণীয় পুষ।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে রসকলি নামক একটি ছোটগল্প নিয়ে কল্লোল পত্রিকায় তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস চৈতালি ঘুর্ণি শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে লেখা। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে, এর পর থেকে আমৃত্যু তিনি অসংখ্য গল্প উপন্যাস লিখেছেন। শেষ বয়সে শ্রান্ত লেখনীকে বিশ্রাম দেবার সুযোগও তাঁর নানা কারণে হয়নি। স্বভাবতঃই সে কারণে তাঁর সব রচনা সমান ভালো নয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য লেখাগুলি মোটামুটি এই রকম --
রাইকমল - ১৯৩৫
ধাত্রীদেবতা - ১৯৩৯
কালিন্দী - ১৯৪০
গণদেবতা - ১৯৪২
পঞ্চগ্রাম - ১৯৪৩
কবি - ১৯৪৪
হাঁসুলি বাঁকের উপকথা - ১৯৪৭
আরোগ্য নিকেতন-
অরণ্যবহি - ১৯৬৬

ছোটগল্প সংকলনগুলি হল
জলসাঘর - ১৯৩৭
রসকলি - ১৯৩৮
বেদেনী - ১৯৪৩
তেরোশো পঞ্চাশ ১৯৪৪

এছাড়া বর্তমানে তাঁর নানা ধরণের গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসে তাঁর যে মানসিকতা দেখা গেছে সেটাই ছোটগল্পগুলিরও বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় একই চরিত্র ও ঘটনা নিয়ে তিনি ছোটগল্প ও উপন্যাস দুটোই লিখেছেন।

উপন্যাস ও ছোটগল্প ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) এক আজন্ম বিদ্রোহী প্রতিভা। অল্পবয়স থেকেই তিনি ছিলেন বেপরোয়া, বেহিসাবী ও উচ্ছৃঙ্খল, অথচ তীক্ষ্মধী ও প্রখরভাবে আত্মসচেতন, ছাত্রাবস্থায় বাজি রেখে প্রবাসীতে একটি ছোটগল্প প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নিয়ে নেন যে সাহিত্যচর্চাই তাঁর জীবন ও জীবিকা হবে। সাহিত্যসাধনার প্রথম দিকে ত্রিশ বছর বয়স হবার আগেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার অনেকগুলিই লিখে ফেলেছিলেন। এই সময় তাঁর বিষয়বস্তু ছিল মনোবিকলন। বিশেষ করে যে সব মন কুটিল জটিল অসাধারণ সেইগুলিই ছিল তাঁর ব্যবচ্ছেদের বিষয়। সেই সময়কার নব্য লেখকদের ওপর ফ্রয়েডের গভীর প্রভাব পড়েছিল। মানিকও সেই প্রভাবের বাইরে ছিলেন না। তাঁর এই পর্বের রচনাগুলিতে আমরা পাই আবেগবিরহিত মনোবিকলন। তা যেমন গভীর তেমনই নিষ্ঠুর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মানিক কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদেন এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে থাকেন যে শিল্পের লক্ষ্য শ্রেণীসংগ্রামের সহায়তা। তাঁর এই পর্বের রচনায় মনোবিকলনের স্থানে প্রধান হয় সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসের বিশ্লেষণ। সে কাজও তিনি প্রায় নির্মম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে করেছেন। তাঁর প্রধান রচনাগুলি এইরকম --
জননী - ১৯৩৫
দিবারাত্রির কাব্য - ১৯৩৫
পুতুলনাচের ইতিকথা ১৯৩৬
পদ্মানদীর মাঝি - ১৯৩৬
অমৃতস্য পুত্রাঃ ১৯৩৮
সহরতলী (২ পর্ব) ১৯৪০-৪১
অহিংসা - ১৯৪১
চিহ্ন - ১৯৪৭
চতুষ্কোণ - ১৯৪৮
সোনার চেয়ে দামি (২খন্ড) ১৯৫১-৫২
তাঁর প্রধান ছোটগল্প সংকলনগুলি হল
অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প ১৯৩৫
সরীসৃপ ১৯৩৯
সমুদ্রের স্বাদ ১৯৪৩
বৌ ১৯৪৩
ভেজাল ১৯৪৪
পরিস্থিতি ১৯৪৬
ছোটবড় ১৯৪৮

মানুষের প্রতি, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ভদ্র শ্রেণীর প্রতি মানিকের আস্থা ছিল না। তাদের প্রতি কার্যকলাপের অন্তরালে তিনি দেখতে পেয়েছেন মতলব ও ভন্ডামি। তুলনায় শেষ পর্বের খেটে খাওয়া সংগ্রামী চাষী মজুরের মধ্যে তিনি মনুষ্যত্বের স্ফুরণ দেখেছেন।
তাঁর গল্প ও উপন্যাসে একই মানসিকতা ব্যক্ত হয়েছে। ছোটগল্পের আঙ্গিকে তাঁর সিদ্ধি অসামান্য। তাঁর ছোটগল্পগুলির বক্তব্য তাই আরও তীক্ষ্ম ও সূচীমুখ।

হাসির গল্প ঃ পরশুরাম।।

পরশুরাম রাজশেখর বসুর (১৮৮০-১৯৬০) ছদ্মনাম। অন্য গম্ভীর রচনায় তিনি স্বনামে থেকেছেন কিন্তু হাসির গল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন ছদ্মনামটি। তাঁকে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ হাসির গল্পের লেখক বললে অত্যুক্তি হয় না।
১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড নামক একটি গল্প প্রকাশ হওয়া মাত্র চারিদিকে সাড়া পড়ে যায় এবং পরশুরাম রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। তখন থেকে প্রায় শেষ জীবন পর্যন্ত মাঝে মাঝে ছেদ দিয়ে তিনি প্রায় শতখানেক গল্প লেখেন। সেগুলি নখানি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগ্রন্থগুলির নাম হল গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, গল্পকল্প, ধুস্তুরিমায়া ইত্যাদি গল্প, আনন্দীবাই ইত্যাদি গল্প, চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প প্রভৃতি । গল্পগুলির মধ্যে কিছু আছে নির্দোষ কৌতুক, কিছু তীব্র স্যাটায়ার, কিছু জগদ্ব্যাপারের তির্যক সমালোচনা।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কথাসাহিত্য।।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে বাঙালী জীবনে নেমে আসে গভীর বিপর্যয়। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা জনস্ফীতি সব মিলিয়ে ঘোর বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিন কাটে। অবস্থা কিছুটা থিতিয়ে এলে দেখা যায় ইতিমধ্যে বাঙ্গালী মানসিকতায় অনেকগুলি পরিবর্তন হয়ে গেছে। পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি ফুটেছে তার কথাসাহিত্যে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাভাষায় গল্প উপন্যাসের যতটা বৈচিত্র্য ও বিস্তার ঘটেছে এমন অন্য কোন শাখায় ঘটে নি। তার কারণ বোধহয় এই যে পরিবর্তমান জীবনযাত্রার সচল ছবি সাহিত্যের এই বিভাগটিতেই সবচেয়ে ভাল ফোটে।

এ যুগের লেখকদের সম্বন্ধে শেষ বিচারের সময় এখনো আসেনি। শুধুমাত্র কয়েকটি প্রবণতা এবং সেই প্রবণতার দু একটি উদাহরণ দিয়েই আধুনিক যুগের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। বলা বাহুল্য এ তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয়।
১) আঞ্চলিক উপন্যাস --
ঢোঁড়াই চরিত মানস -- সতীনাথ ভাদুড়ি
গঙ্গা - সমরেশ বসু
তিস্তাপারের বৃত্তান্ত -- দেবেশ রায়

২) ইতিহাসের নবনির্মাণ --
সাহেব বিবি গোলাম -- বিমল মিত্র
কেরী সাহেবের মুনশি -- প্রমথনাথ বিশি
সেই সময় -- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
মৈত্রেয় জাতক - রাণী বসু

৩) রাজনৈতিক উপন্যাস --
তিন পুষ -- সমরেশ বসু
প্রেম নেই -- গৌরকিশোর ঘোষ
হাজার চুরাশির মা -- মহাশ্বেতা দেবী

৪) চেতনাপ্রবাহের উদঘাটন
বিবর - সমরেশ বসু
ঘুনপোকা - শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
আত্মপ্রকাশ -- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এছাড়া উপন্যাসের পূর্বপ্রচলিত ধারাগুলি সবই আছে। আছে জনপ্রিয় সুখপাঠ্য সুবৃহৎ উপন্যাস। বর্তমানের লেখকেরা ছোটগল্পেও অতিশয় দক্ষ। জীবনের নানা দিক স্থূল ও সূক্ষ্ম ক্রমাগতই ব্যপ্ত হয়ে চলেছে সমকালীন বাংলা সাহিত্যে।

প্রবন্ধ
বাংলা প্রবন্ধ।।

প্রবন্ধসাহিত্যের দুটি ধারা ১) বিষয়নিষ্ঠপ্রবন্ধ, ২) ব্যক্তিগত রচনা। বাংলা গদ্যের সূচনা থেকেই প্রথম ধারাটি বর্তমান ছিল। সাহিত্যে দ্বিতীয় ধারাটির প্রথম লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দুটি ধারাতেই বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর। বিশেষ করে প্রথমটির ক্ষেত্রে তেমন কোনো সৃজনশীল প্রতিভা না থাকলেও চলে। পরিশ্রম, ভাষাজ্ঞান এবং আন্তরিকতা থাকলে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখা যায়। অনেক সময় সাময়িক পত্রাদিতে অতি উজ্জ্বল এরকম লেখা বেরোয়। কালক্রমে তা হারিয়েও যায়। এই শাখার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সেজন্য দেওয়া শক্ত। কেবল এই ধারায় যাঁরা বিশেষ প্রকার মৌলিকতা দেখিয়েছেন তাঁদেরই উল্লেখ করা হল।
প্রবন্ধঃ বঙ্কিমচন্দ্র
১) বিষয়নিষ্ঠপ্রবন্ধ-- বিবিধ প্রবন্ধ ২ খন্ড
২) ব্যক্তিগত কমলাকান্তের দপ্তর
বঙ্কিমের পরিব্যাপ্ত মনীষার নানাদিক বিবিধ প্রবন্ধে ফুটছে। সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ক রচনা এখানে আছে।

কমলাকান্তের দপ্তরের পরিকল্পনার সঙ্গে ডি কুইন্সির Confessions of an opium eater এর প্রাথমিক সাদৃশ্য আছে। তবে কমলাকান্ত চরিত্র আরও গভীর ও বহুস্তরবিশিষ্ট। বাইরে সে এক নেশাখোর, ভবঘুরে, নিঃসম্বল আধপাগল কৌতুকের পাত্র। অন্তরে বঙ্কিম মনীষার সারভাগ দিয়ে তৈরী। তার তির্যক দৃষ্টিতে বঙ্কিম সমসাময়িক জীবন বিচিত্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রবন্ধঃ রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যের পরিমান বিপুল। বিষয়বৈচিত্র্য ও অসাধারণ। তাঁর রচনাবলী সম্পাদনকালে সম্পাদকগন নিম্নলিখিত ভাগে তাদের ভাগ করেছিলেন -- ১) আত্মপরিচয়, ২) ঋিযাত্রী, ৩) পত্রাবলী, ৪) ধর্ম, ৫) স্বদেশ ও সমাজ, ৬) শিক্ষা, ৭) ভাষা ও সাহিত্য, ৮) বিবিধ প্রসঙ্গ। এর প্রত্যেকটির মধ্যে আছে অসংখ্য উপবিভাগ। বিষয়ানুসারে উপস্থাপনপদ্ধতিরও তারতম্য আছে। তবে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় প্রবন্ধের কয়েকটা সাধারণ লক্ষণ আছে। সেগুলি হল
১) তিনি কোথাও পারিভাষিক শব্দ, আপ্তবাক্যের উদ্ধৃতি ইত্যাদি ব্যবহার করেন না।
২) প্যেকটি বিষয়ই তাঁর নিজ অনুভূতির মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে আসে। মনে হয তিনি কোনও কিছু প্রমাণ করছেন না। সমালোচ্য বিষয় প্রভাবে আপন মানস প্রতিত্রিয়া লিপিবদ্ধ করছেন মাত্র।
৩) গুগম্ভীর বিষয়েও তাঁর ভাষার কাব্যবিভা লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও কথাসাহিত্যের তুলনায় তাঁর প্রবন্ধের পাঠক কম। কিন্তু এই বিভাগে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার অনেকগুলিও স্থান পেয়েছে। গুণগত মান ও আকর্ষণী শক্তির দিক দিয়ে প্রতি বিভাগের দু একটি বইয়ের উল্লেখ করা গেল।
১) আত্মপরিচয় বিভাগে -- জীবনস্মৃতি
২) ঋিযাত্রী বিভাগে -- য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র
৩) পত্রাবলী বিভাগে -- ছিন্নপত্র
৪) ধর্ম বিভাগে -- ধর্ম
৫) স্বদেশ ও সমাজ বিভাগে -- কালান্তর
৬) শিক্ষা বিভাগে -- শিক্ষা
৭) ভাষা ও সাহিত্য -- প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য।
৮) বিবিধ প্রসঙ্গ -- পঞ্চভূত, বিচিত্র প্রবন্ধ।

প্রবন্ধঃ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রামেন্দ্রসুন্দর (১৮৬৪-১৯১৯) বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন কিন্তু দর্শন, সাহিত্য, ধর্মতত্ব, স্মৃতি, পুরান, ব্যাকরণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। তার সঙ্গে ছিল মনস্বিতা, চিন্তাশীলতা এবং গু বিষয়কে সহজ করে বলবার ক্ষমতা। তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলি হল ১) প্রকৃতি, ২) জিজ্ঞাসা, ৩) কর্মকথা, ৪) শব্দকথা, ৫) বিচিত্র জগৎ প্রভৃতি।

প্রবন্ধঃ প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) বা ছদ্মনামে বীরবল বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় নাম। তিনি সবুজপত্রের সম্পাদক এবং বাংলায় চলিত ভাষা ব্যবহারের সর্বপ্রধান প্রচারক। ভাবাবেগ জর্জর বাংলাদেশে তিনি একটি স্পষ্ট তীক্ষ্ণ ও ঋজু মননের ধারা প্রবাহিত করেছিলেন। ১) তেল নুন লকড়ি, ২) নানাকথা, ৩) নানাচর্চা, ৪) বীরবলের হালখাতা প্রভৃতি তাঁর প্রধান গ্রন্থ। পরবর্তীকালে এগুলি একত্র সংকলিত হয়ে প্রবন্ধ সংগ্রহ নামে প্রচলিত আছে।

প্রবন্ধঃ বর্তমান অবস্থা।।

একাল বিশেষজ্ঞের যুগ। একজনের পক্ষে নানারকমের প্রবন্ধ লেখার কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। সেইজন্য জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে স্বচ্ছন্দ বিচরণশীল প্রাবন্ধিকদের আর আমরা দেখতে পাইনা। কিন্তু নিজ নিজ বিষয়ে উৎকৃষ্ট নিবন্ধ লিখেছেন এমন গুণী ব্যক্তি অনেক আছেন। সংস্কৃতি বিষয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য বিষয়ক নিবন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, আবু সঈদ আইয়ুব, প্রভৃতিরা স্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। এখনও ইতিহাস রাজনীতি দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ অনেকেই লেখেন। রম্যরচনা ও রসরচনার ধারাটিও যথেষ্ট গতিশীল। যদিও গল্প উপন্যাস কবিতার তুলনায় এ পথে পথিকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।

বাংলা নাটক ।।

উৎপত্তি - সংস্কৃত ভাষায় ভালো নাটক ছিল। মধ্যযুগের বাংলায় ঠিক নাটক না থাকলেও গান সংলাপ কথকতা মিশিয়ে নাটগীতপালা নামক একধরণের জিনিস ছিল। পরবর্তীকালে তার থেকেই এসেছিল যাত্রা। আধুনিক বাংলা নাটকে এদের প্রভাব আছে, কিন্তু এদের আদর্শে তা রচিত হয় নি। নতুন কালের শহর কলকাতায় ইংরেজের রঙ্গালয় দেখে তাদের নাটক পড়ে নব্যশিক্ষিতের মনে বাংলায় সেরকম জিনিস লেখবার ইচ্ছায় উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটকের সূচনা হয়েছিল। প্রথম দিকে অভিনয়ের ইচ্ছাটাই ছিল প্রধান। ধনবান গৃহস্থেরা নিজ নিজ বাড়িতে স্টেজ তৈরী করে ইংরাজী বা সংস্কৃত নাটকের অভিনয় করতেন। অনেক সময়েই বাংলায় অনুবাদ করে নিয়ে অভিনয় করতেন। দু একটি মৌলিক রচনাও ১৮৫২র পর থেকে হয়েছে। তাদের মধ্যে যাত্রা বা নক্শার লক্ষণই বেশী। এই পরিস্থিতিতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদনের হাতে প্রথম উন্নতমানের মৌলিক বাংলা নাটক লেখা হল এবং শু হল নতুন এক সাহিত্যধারার।

নাটক ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

বেলগাছিয়ার রাজাদের রঙ্গালয়ে সংস্কৃত রত্নাবলী নাটকের রামনারায়ণ তর্করত্ন কৃত অনুবাদের মহড়া হচ্ছিল। মধুসূদনের বন্ধুরা এই অভিনয়ে জড়িত ছিলেন। তাদের একরকম চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মধুসূদন শর্মিষ্ঠা নামে একটি নাটক অতি অল্প কালে লিখে ছিলেন। কাহিনী যদিও পুরাণ থেকে নেওয়া কিন্তু চরিত্রসৃজন, ঘটনাসংস্থান, সংলাপ সবই ভিন্ন স্বাদের। পুরানের চরিত্রকল্পনাও মধুসূদন বদলে দিয়েছেন। নাটকটি মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছিল। উৎসাহিত হয়ে মধুসূদন পরবর্তী নাটকগুলি লিখেছিলেন –
শর্মিষ্ঠা - ১৮৫৯
পদ্মাবতী - ১৮৬০
একেই কি বলে সভ্যতা - ১৮৬০
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ - ১৮৬
কৃষ্ণকুমারী - ১৮৬১

শর্মিষ্ঠা পুরাণাশ্রয়ী কমেডি। পদ্মাবতীতে মধুসূদন সংস্কৃত রোমান্টিক কমেডি ও গ্রীক পুরানের কাহিনী মিশিয়ে নতুন ধরণের রসসৃষ্টি করেছেন। কৃষ্ণকুমারী ঐতিহাসিক ট্রাজেডি। একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ যথাক্রমে ইয়ংবেঙ্গল ও রক্ষণশীলদের বিষয়ে প্রহসন। প্রত্যেকটিই নতুন ধারার। নাট্যকৌশলের যৎসামান্য ত্রুটি শর্মিষ্ঠাতে থাকলেও অন্যগুলি নির্দোষ ও অতি উন্নতমানের রচনা। বিশেষ করে প্রহসনদুটির বাস্তবতা নাট্যগুণ ও সমাজসমালোচনার নিরপেক্ষ ভঙ্গী বিরল নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দেয়। পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের ওপর তাঁর প্রহসনদুটির গভীর প্রভাব আছে।

নাটক ঃ দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)।।

সরকারী কাজের সূত্রে দীনবন্ধুকে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হত। তখন তিনি গ্রামবাংলায় প্রজাসাধারণের ওপর নীলকরের অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তার ওপর সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেশবার একটা অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাদের ওপর ছিল গভীর সহানুভূতি। এই সব মিলে মিশে তাঁকে নীলদর্পণ নাটক রচনার প্রেরণা জোগায়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নাম গোপন করে তিনি নীলদর্পন প্রকাশ করেন। জাতীয় জীবনে এই নাটকের প্রভাব হয়েছিল অপরিসীম। আমেরিকায় দাস প্রথা নিবারণে Uncle Tom's Cabin এর যে ভূমিকা ছিল বাংলার নীলকর অত্যাচারের প্রেক্ষিতে নীলদর্পনেরও সেই ভূমিকা।
নীলদর্পনের পরে দীনবন্ধু আর কণ রসের নাটক লেখেন নি। পরবর্তী নাটকগুলি সবই প্রহসন বা কমেডি। তাঁর রচনাবলী মোটামুটি এই রকম।
নীলদর্পণ - ১৮৬০
নবীন তপস্বিনী - ১৮৬৩
বিয়ে পাগলা বুড়ো - ১৮৬৬
সধবারা একাদশী - ১৮৬৬
লীলাবতী - ১৮৬৭
জামাই বারিক - ১৮৭২
কমলেকামিনী - ১৮৭৩

তাঁর নীলদর্পণ পরবর্তী নাটকগুলির মধ্যে সধবার একাদশী শ্রেষ্ঠ। বিফল জীবন, বিফলীকৃত শিক্ষা, মদ্যপ নিমচাঁদের মধ্য দিয়ে তিনি পথভ্রষ্ট ইয়ংবেঙ্গলদের পরিণতি দেখিয়েছেন। প্রহসনের উতরোল হাস্যের নীচে এখানে অশ্রু প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

নাটক ঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১)।।

বাংলা নাটকের জগতে গিরিশচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব নটরূপে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এদেশে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে নট ও নাট্যপরিচালকরূপে যোগ দেন। দীনবন্ধু মধুসূদনের নাটক তো বটেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের রচনার নাট্যরূপ দিয়েও তখন অভিনয় চলত। সাধারণ লোকে টিকিট কেটে থিয়েটার দেখবার সুযোগ পাওয়া মাত্র কলকাতা শহরে দিকে দিকে রঙ্গালয় দেখা দিচ্ছিল। ফলে নাটকের চাহিদা ছিল প্রচুর। তখনও বাংলা সাহিত্যের পরিধি খুব বড় নয়। প্রচলিত গল্প উপন্যাস নাটক সব যখন ব্যবহার করা হয়ে গেল তখন বাধ্য হয়ে অভিনয়ের প্রয়োজনে গিরিশচন্দ্র নিজে নাটক রচনায় হাত দিলেন। নাতিদীর্ঘ সময়সীমায় তিনি প্রায় আশিটি নাটক লিখেছিলেন। মাঝে মাঝে এক রাতের মধ্যেও তাঁকে চলনসই নাটিকা লিখতে হয়েছে। ফলে অনেক লেখাই হয়েছে ফরমাসী নিম্নমানের রচনা।

মনঃসংযোগ করে যে নাটকগুলি লিখেছেন তাতে স্থানে স্থানে উন্নত নাট্যগুণের বিকাশ হয়েছে। যদিও আজকের নিরপেক্ষ বিচারে গিরিশচন্দ্রকে খুব বড় সাহিত্যিক বলা চলে না, এবং যদিও মধুসূদন বা দীনবন্ধুর তুলনায় তাঁর নাট্যমান অনেক নিচু তবু বাংলা নাটকের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র একজন চিরস্মরণীয় পুষ হয়ে বিরাজ করবেন। নাটক এক সিমন্বিত শিল্প, নাট্যকার, নট, অভিনয়, প্রযোজনা সবকিছু মিলিয়ে তার সার্থকতা। নাটকের এই সব কটি দিকের ওপর দীর্ঘকাল ধরে রাজার মত নিয়ন্ত্রণ করেছেন গিরিশচন্দ্র। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের নয়, আপামর জনসাধারণের চাহিদা তাঁর মত করে খুব কম নাট্যকারই বুঝতেন। সে পিপাসা তিনি দীর্ঘকাল ধরে মিটিয়েছিলেন এবং পরবর্তী নাট্যকর্মীদের কাছে একটা পথনির্দেশও রেখে গিয়েছিলেন। এইজন্যই তিনি স্মরণীয়।

গিরিশচন্দ্র নানা ধরণের নাটক লিখেছিলেন --

১) গীতিনাট্য -- আগমনী, অকালবোধন, দোললীলা প্রভৃতি
২) পৌরাণিক নাটক -- রাবনবধ, চৈতন্যলীলা, জনা, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি
৩) সামাজিক নাটক -- প্রফুল্ল, বলিদান ইত্যাদি
৪) ঐতিহাসিক নাটক -- সিরাজদৌল্লা, মীরকাসিম, ছত্রপতি শিবাজী ইত্যাদি
৫) প্রহসন ও পাঁচমিশালি -- বড়দিনের বকশিস,
৬) অনুবাদ -- ম্যাকবেথ

গান, আবেগ, ভক্তি ও পৌরাণিক প্রসঙ্গে সেকালের বাঙ্গালীর চাহিদা গিরিশচন্দ্র যথাযথ বুঝেছিলেন এবং তদনুযায়ী নাটক লিখেছিলেন। তাঁর ধারায় তাঁর সমসাময়িক কালেই অনেক নাট্যকার রঙ্গমঞ্চের চারপাশে জড়ো হন। তাঁদের অনেকেই বিচ্ছিন্নভাবে দু একটি উৎকৃষ্ট নাটক লিখেছেন। প্রবাহ রক্ষাকারী এই লেখককুল সেকালের বাংলা রঙ্গমঞ্চকে প্রাণচঞ্চল করে রেখেছিলেন।

নাটক ঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

গিরিশচন্দ্রের পরে সত্যিকার বড় নাট্যকার হিসাবে আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে পাই। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, ইংরাজি সাহিত্যে কৃতিবিদ্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতে সুপন্ডিত দ্বিজেন্দ্রলালের বহু বিদ্যায় আগ্রহ ছিল। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন মূলতঃ কবি। সঙ্গে দু একটি প্রহসনও লেখেন। হাসির গান লেখায় তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

যৌবনে স্ত্রীবিয়োগের পর তাঁর জীবনে একটা বড় পরিবর্তন আসে। ঐতিহাসিক নাটকের ভাবগম্ভীর সমুন্নত জগৎ তখন তাঁকে আকর্ষণ করে, এবং তিনি পর পর কতকগুলি ঐতিহাসিক নাটক লেখেন। প্রধানগুলি হল

প্রতাপসিংহ - ১৯০৫
দুর্গাদাস - ১৯০৫
নুরজাহান- ১৯০৮
মেবার পতন- ১৯০৮
শাজাহান - ১৯০৯
চন্দ্রগুপ্ত- ১৯১১

আজকের বিচারে এই সব নাটকের অনেক অংশই অতিনাটকীয় মনে হতে পারে। কিন্তু মঞ্চে অভিনয়কালে সে সব ত্রুটি অনেকটা ঢেকে যায়। নাট্যগঠনে দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্‌সপীরীয় রীতি পুরোপুরি অবলম্বন করেছেন এবং ট্র্যাজেডি নির্মাণে শেক্‌সপীরীয় চরিত্রপরিকল্পনাই গ্রহণ করেছেন। সমুন্নত আদর্শবাদ, স্বদেশপ্রেম, কাব্যময় ভাষা, এবং গানের প্রাচুর্য তাঁর নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য।

নাটক ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।।

গিরিশ যুগের পূর্ণ প্রভাবের মধ্যে বড় হয়েও রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন প্রচলিত ধারার নাটক রচনার দিকে তাকাননি। অথচ প্রায় কিশোর বয়স থেকে শু করে সারাজীবন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধারায় নাটক তিনি লিখেছেন। শিক্ষিত সমাজে তাদের চর্চা হয়েছে। শৌখীন নাট্যদলে অভিনয় হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ তাঁর নাটক গ্রহণ করেনি। কারণ রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যান্য অংশের মত তাঁর নাটক বুঝতে গেলেও গভীর বোধশক্তির প্রয়োজন হয়।

প্রথম জীবনে তিনি মূলতঃ গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্য লিখেছেন, গদ্যনাটক যে দু একটি আছে তা হালকা প্রহসনধর্মী রচনা। তাঁর প্রধান এই নাটকগুলি হল --

গীতিনাট্য -
বাল্মীকিপ্রতিভা -- ১৮৮১
কালমৃগয়া - ১৮৮২
মায়ার খেলা - ১৮৮৮

কাব্যনাট্য -
প্রকৃতির প্রতিশোধ ১৮৮৪
রাজা ও রাণী ১৮৮৯
বিসর্জন ১৮৯০
চিত্রাঙ্গদা ১৮৯২
বিদায় অভিশাপ

বিদায় অভিশাপ ১৮৯২
মালিনী ১৮৯৬
কাহিনী ১৯০০

হাস্যরসাত্মক নাটক
গোড়ায় গলদ ১৮৯২
বৈকুণ্ঠের খাতা ১৮৯৭
ব্যঙ্গ কৌতুকু, হাস্যকৌতুক - ১৯০৭
চিরকুমার সভা ১৯২৬

তত্বনাটক
শারদোৎসব ১৯০৮ পরিবর্তনে ঋণশোধ
বা রাজা ১৯১০ পরিবর্তনে অরূপরতন
রূপক ও অচলায়তন ১৯১২ পরিবর্তনে গু
সাংকেতিক ডাকঘর ১৯১২
নাটক ফাল্গুনী ১৯১৬
মুক্তধারা ১৯২৫
রক্তকরবী ১৯২৬
কালের যাত্রা ১৯৩২

গদ্যনাটক
পায়শ্চিত্ত (সংশোধন পরিত্রাণ) ১৯০৯
শোধবোধ ১৯১৬
গৃহপ্রবেশ ১৯২৫
তপতী ১৯৩০
বাঁশরি ১৯৩৪
নটীর পূজা ১৯২৬

নৃত্যনাট্য
চিত্রাঙ্গদা ১৯৩৬
চন্ডালিকা ১৯৩৯
শ্যামা ১৯৩৯
তাসের দেশ

গীতিনাট্য – কিশোর বয়সে ইংলন্ডে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ফিরে এসে আগে থেকে জানা প্রাচ্য সংগীতশিক্ষার সঙ্গে এই নতুন অভিজ্ঞতা মিশিয়ে তিনি বাল্মীকি প্রতিভার নাট্যগীতি তৈরী করেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে এই ধরণের দুরূহ পরীক্ষায় তিনি সাহস করেছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন। এ ঘটনার প্রভাব তাঁর সারা জীবনের সংগীতসাধনাতে রয়ে গেছে।

কাব্য নাট্য----

মধূসূদনের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে তার কাব্যনাট্য লেখার ইচ্ছা ছিল । সে ইচ্ছা তিনি কাজে পরিণত করতে পারেন নি , তার পরবর্তী বাঙ্গালী নাট্যকারেরা সে ধরনের আকাঙ্খা পোষন করেন নি । রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কাব্য নাট্য দিয়েই তাঁর সিরিয়াস নাটক গুলি শু করলেন । রবীন্দ্র স্বভাবধর্মের মধ্যে এর কারণ নিহিত আছে । রবীন্দ্রনাটকে চরিএদ্বন্দ্বের চেয়ে প্রধান হয়েছে ভাবদ্বন্দ্ব। প্রকৃতির প্রতিশোধে সন্ন্যাসীর সমস্যা বৈরাগ্য ও স্নেহের বিসর্জনে সংঘাত বেঁধেছে প্রেম ও প্রতাপের। রাজা ও রাণীর সংঘাত আত্মকেন্দ্রিক প্রেম ও রাজার কর্তব্যে । আর মালিনী ও কাহিনী নাট্য কাব্যগুলিতে কবি সন্ধান করেছেন ধর্মের স্বরূপ । এই সব সমস্যা ও সন্ধান কোনটিই মাটির পৃথিবীর যুদ্ধবিগ্রহ অথবা ঘরসংসারের গল্প নয় । এখানকার চরিত্রপাত্রদের মনের তার উঁচু সুরে বাঁধা । তাই কাব্য ভাষাই তাদের ভাব প্রকাশের উপযুক্ত বাহন হতে পারে । অথচ এগুলি গীতিকাব্য নয় , ঘটনা ও চরিত্র নিয়ে রীতিমত ছকে বাঁধা । রবীন্দ্রনাথ তাই এগুলির জন্য মাত্রাবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান কোনো ঝংকার ময় ছন্দ কোথাও ব্যবহার করেন নি, ব্যবহার করেছেন অমিত্রাক্ষর । পরে প্রবহমান পয়ার। এই ছন্দে আছে গদ্যের প্রবহমানতা ও ভারবহন শক্তি । গল্পের গতির সঙ্গে তা মানিয়ে গেছে।

রূপক ও সাংকেতিক নাটক --- বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় অবদান এই নাটকগুলি । এ ধারার উৎপত্তিও তাঁরই হাতে ।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তর ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে । কবিরা বুঝেছে আমাদের বহু মনোভাব অন্তরের মধ্যে সর্বদা উঠছে পড়ছে । বাইরে তাদের কোনো প্রকাশ নেই। তারা এও দেখেছে যে আধুনিক জগৎ ও জীবন কে ঘিরে অনেক বক্তব্য পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে রয়েছে যে সাহিত্যের পূর্বপ্রচলিত ছকগুলিতে তাদের প্রকাশ করা যায় না । এই অধরাকে শব্দবন্ধনে বাঁধার আগ্রহ থেকে নতুন নতুন রূপকল্পের জন্ম হয়। এইভাবেই উনবিংশ শতকের শেষে পাচাত্যে আসে সাংকেতিক নাটক ।

পুরানো রূপক সাহিত্যের সঙ্গে এর প্রভেদ আছে । এখানে খাপে খাপে মেলানো কোনো উপমেয় উপনাম সম্পর্ক নেই । আধুনিক রূপক নাটকের প্যাটার্ন হল এই যে সেখানে একটি করে বুদ্ধি গ্রাহ্য লৌকিক কাহিনী থাকে। সেই কাহিনীর নিজস্ব আবেদন আছে । কিন্তু কাহিনীতেই নাট্যকারের বক্তব্য শেষ হয় না । ঐ গল্প অবলম্বন করে শিখার চারিধারে আলোর মত নানারকম ইঙ্গিত সংকেত খেলা করে বেড়ায় । সব মিলিয়ে আমাদের মনে একটা বৃহৎ ভাবের ছায়াপাত ঘটে। এটা স্পষ্ট ও পরিস্কার কোনো কাহিনী নয় ।

রবীন্দ্রনাথের কবিসভাবের সঙ্গে এই নাট্যআঙ্গিক খুবই মেলে । ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শারদোৎসব নাটক নিয়ে তিনি এই ধারার সূত্রপাত করলেন । ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল বলে তিনি সেখানকার মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ও শিক্ষকদের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতায় এই নাটকগুলিকে মঞ্চস্থ করতে পারলেন । শারদোৎসব ও ফাল্গুনীতে তিনি দেখিয়েছেন মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, রাজা ও ডাকঘরে আছে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক সন্ধান এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের নানারকম দিক নিয়ে লেখা হয়েছে অচলায়তন , মুক্ত ধারা রক্তকরবী ও ক
ালের যাত্রা। কাব্যনাট্যে তিনি গান দেন নি । এখানে গানের প্রয়োগ অবিরল , কারণ গান কথার চেয়েও ইঙ্গিতময়।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী বাংলা নাটক ।।

বাংলা নাটকের মূল ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগ ছিল না । সেখানে পুরানো ধারার অনুবৃত্তি চলেছিল বছরের পর বছর । নতুন নাট্যকারেরা এসেছেন । মোটামুটি ভালো ন
াটকও কিছু লেখা হয়েছে । কিন্তু প্রতিভার যে উদ্ভাস নতুন করে পথ কেটে নেয় তা দেখা যায় নি । অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে রঙ্গমঞ্চে শক্তিশালী অভিনেতার অভাব ছিল না । পরে চল্লিশের দশক থেকে নবনাট্য আন্দোলন আসে । আরও পরে নতুন নতুন নাটকের দল নানা রকমের পরীক্ষামূলক নাটক মঞ্চস্থ করেন । নাট্যাঙ্গিকের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যায় । কিন্তু এ সব হয় পুরানো নাটকে । নয়ত গল্প উপন্যাসের নাট্যরূপ অথচ বিদেশী নাটকের স্বদেশী রপান্তর কিংবা ভাবানুবাদ-র মধ্যে ক্বচিৎ বিরল ব্যতিক্রমের মতো ঝলসে ওঠে বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন , কিংবা শম্ভু মিত্রের চাঁদ বণিকের পালা । কিন্তু এগুলি বিছিন্ন উদাহরণ । রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কথা সাহিত্যের ও কবিতায় প্রভূত উন্নতি হয়েছে । কিন্তু নাটক রচনার দিকে প্রতিভাশালী লেখকরা এগিয়ে আসেনি ।

কাব্যনাটক ঃ বুদ্ধদেব বসু

একমাত্র ব্যতিক্রম বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) আয়ুর শেষ প্রান্তে এসে তিনি কয়েকখানি কাব্যনাট্য রচনা করেন । বহুদিন উপেক্ষিত থাকার পরে ইদানীং কোনো কোনো নাট্যদল তা অভিনয় করেছেন । নাটকগুলি হল—
তপস্বী ও তরঙ্গিনী
অনাম্নী অঙ্গনা
প্রথম পার্থ
কালসন্ধ্যা
সংক্রান্তি
এগুলি সবই পুরানোর নবনির্মাণ । গল্পগুলি পুরানো তার মধ্যকার জীবন বোধ আধুনিক কালের । ভাষা ছন্দের দোলন আছে , তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছন্দের কোনো প্রচলিত ছকে তাকে ফেলা যায় না।

বাংলা মহাকাব্য ও আখ্যান কাব্য ।।

আধুনিক যুগের সূচনা – ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা কাব্যের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখে অবাক লাগে যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল (১৭৫২) রচনার পরে প্রায় একশ বছরের মধ্যে কোনো বড় কবি ছিলেন না । সেই রাজনৈতিক স
ামাজিক সাংস্কৃতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন শুধু কবিওয়ালারা । গ্রাম্য মানসিকতার কাছে তাদের রচনার প্রমোদমূল্য ছিল কিন্তু সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু ছিল না ।

নতুন যুগে শহর কলকাতায় যখন শিক্ষা সংস্কৃতির একটা আবহ আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে । তখন যে কবি আমাদের কিছুটা মনোযোগ আর্কষণ করেছিলেন তিনি ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। তিনি পুরানো কবিওয়ালাদেরই একপ্রকার উন্নত মার্জিত সংস্করণ। রঙ্গরসে আকণ্ঠ নিমগ্ন এই কবির চুটকি কবিতায় আধুনিকতার কিছু সংকতে ধবনিত হয়েছিল । তিনি সমসাময়িক ইয়ংবেঙ্গল ও প্রাচীন পন্থী , সমাজসংস্কারক ও রক্ষণশীল, স্ত্রী শিক্ষা ও বিধবাবিবাহ সব কিছু নিয়েই উপভোগ্য ঠাট্টা তামাশা করেছেন , প্রাচীন কবিওয়ালাদের মত আদিরসের দিকে যান নি ।

তাঁরই স্নেহভাজন শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) তারই সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকরের পাতায় শিক্ষানবিশি সেরে নতুন প্রণালী কাব্য রচনার চেষ্টা করেছিলেন । তাঁর পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮) কর্মদেবী, শূরসুন্দরী , কাঞ্চীকাবেরী প্রভৃতি বীররসাত্মক আখ্যানকাব্যের বিষয় বস্তু তিনি রাজপুত ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করেছিলেন । নব যুগের উপযুক্ত ভাষা অবশ্য তিনি দিতে পারেননি । পুরানোপয়ার ত্রিপদীই তাঁর অবলম্বন ছিল। তাঁর সম্বন্ধে সুকুমার সেনের মন্তব্যটি স্মরণীয় ——“ তাঁহার রচনার কাব্যিক মূল্য বেশী নয় কিন্তু উহার দ্বারা নিশীথিনীর মৌন যবনিকা অপসারণের প্রথম সংকেত ধবনিত হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে তাঁহার বিশিষ্ট মূল্য আছে ।

মহাকাব্য ও অন্যান্য কাব্য ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত।।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক মধুসূদন এককালে ইংরাজি ভাষার কবি হবার বাসনা পোষণ করতেন । কিন্তু তাঁর ভবিতব্য ছিল অন্যরকম । শর্মিষ্ঠা রচনার সময় বেলগাছিয়া রঙ্গ
ালয়ে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বাজি রেখে তিনি বাংলার অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করলেন । মধুসূদনের প্রতিভা উল্কার মত হঠাৎ দেখা দিয়ে আকাশ উদ্ভাসিত করে অচিরে মিলিয়ে গেছে । তাঁর প্রধান রচনাগুলি সবই পরবর্তী দুতিন বছরের সৃষ্টি । কাব্যগ্রন্থগুলি হল——
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ১৮৬০
মেঘনাদবধ কাব্য ১৮৬১
ব্রজাঙ্গনা কাব্য ১৮৬১
বীরাঙ্গনা ১৮৬২
চতুর্দশপদী কবিতাবলী ১৮৬৬

মধুসূদন বুঝেছিলেন পুরানো পয়ার ত্রিপদীর মন্থর চলন এযুগের ভাবকল্লোলকে ধারন করতে অসমর্থ । অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবাহ বাধাহীন ও উদাত্ত । বীররসাত্মক সমুন্নত ভাবের কাব্যের তা উপযুক্ত বাহন । মধুসূদনের এই ধারণা যে কতদুর অভ্রান্ত ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে। তাঁর পরবর্তী মহাকাব্য এবং রাবীন্দ্রিক কাব্যনাট্য সবেরই ভিত্তি তাঁর অমিত্র
াক্ষর ।

তিলোত্তমাসম্ভবকে মধুসূদন পুরোপুরি মহাকাব্য বলেন নি বলেছেন —" A tale rather heroically told"
মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য । এর কাহিনী রামায়ণ থেকে নেওয়া । ঘটনা কাল দুই রাত ও তিন দিন। এই সংহত পরিসরে রামায়ণ কাহিনীর আভাস দিয়েছেন লেখক কিন্তু রামায়ণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন বদলে । এই কাব্যে রাম নায়ক নন, তিনি দৈবানুগৃহীত দীনমতি মানুষ , নায়ক রাবণ, যিনি আহত অহংকারে একদিন সীতাহরণ করে এনে আর পিছু ফিরতে পারেন না । তার চোখের সামনে পুত্রপরিজনেরা বিনষ্ট হয় । স্বর্ণলঙ্কা ভেঙ্গে পড়ে। ধবংসের মাঝখানে নিয়তিপ্রহৃত ট্রাজিক নায়ক বসে থাকেন ।

বীরাঙ্গনা খন্ডকাব্য। ওভিদের Heroic Epistle এই কাব্যের অনুপ্রেরণা। ব্রজাঙ্গনা ঔস্তুন্দ জাতীয় গীতিকবিতা। চতুর্দশপদী কবিতাবলী বাংলা ভাষার প্রথম সনেট । এই কবিতাগুলি লেখবার সময় মধুসূদনের প্রতিভা ক্ষীণ হয়ে এসেছে । ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে প্রবাসে বিপদে ঋণ ও কারাবাসের ভয় মাথায় নিয়ে তাঁর মনে স্বদেশের ছোটস্মৃতি ভেসে উঠেছিল যা সনেটের আকারে তিনি তাদের রূপ দিয়েছিলেন ।
মধুসুদনের সাহিত্যিক জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। রচনা পরিমাণেও সামান্য । কিন্তু কাব্য ও নাটক যে কটি তিনি লিখেছেন প্রত্যেকটিই নতুন এবং প্রত্যেকটিই বাংলা সাহিত্যের এক একটি করে নতুন পথ খুলে দিয়েছে । পরবর্তী কালের সাহিত্যিকেরা অনেকদিন ধরে সেই সব পথেই হেটেছেন।

মহাকাব্য ও অন্যান্য ঃ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মানুষের ধ্যান ধারণা ও রসকল্পনা যে সব কবির মধ্যে পূর্নমাত্রায় প্রকট হয়েছিল হেমচন্দ্র তাঁদেরই একজন। মধুসূদনের প্রদর্শিত ধারাগুলি তিনি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর রচনার পরিমাণ বিপুল। সমকালে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন খুবই। কিন্তু আজকের নিরপেক্ষ বিচারে বোঝা যায় মধুসূদনের প্রতিভা তাঁর ছিল না। তিনি ইতিহাসের প্রবাহ রক্ষাকারী কবিমাত্র। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা ঃ

বৃত্রসংহার - ২ খন্ডে লেখা বৃহৎ মহাকাব্য - ১৮৭৫-৭৭। এছাড়া তিনি বীরবাহু কাব্য নামক আখ্যানকাব্য, আশাকানন, দশ মহাবিদ্যা প্রভৃতি রূপক কাব্য এবং প্রচুর গীতিকবিতা লিখেছিলেন।

মহাকাব্য ও অন্যান্য ঃ নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

বাংলা সাহিত্যে হেমচন্দ্রর যে ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্য নবীন চন্দ্রেরও তাই। তাঁর রচনার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দুইই অনেক। এর মধ্যে যে রচনাটির জন্য তিনি সর্বাধিক স্মরণীয় তা হল কৃষ্ণজীবন নিয়ে লেখা তিনটি খন্ডে বিভক্ত একটি সুবৃহৎ মহাকাব্য। খন্ডগুলি হল (১) রৈবতক - ১৮৮৬
(২) কুরুক্ষেত্র - ১৮৯৩
(৩) প্রভাস - ১৮৯৬

এই তিনখানি কাব্যে মহাভারতকথার আধারে উনবিংশ শতাব্দীর দর্শন বিজ্ঞান সমাজতত্ব ও ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি পলাশীর যুদ্ধ নামক ঐতিহাসিক কাব্য, খৃষ্ট, অমিতাভ, অমৃতাভ প্রভৃতি জীবনীকাব্য, রঙ্গমতী নামক গাথাকাব্য, গদ্যে পাঁচ খন্ডে পরিব্যাপ্ত একটি আত্মজীবনী এবং প্রচুর গীতিকাব্য লিখেছেন।

হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও তদনুসারী কবিকুল একদা বাংলা আখ্যান কাব্যের আসরটিকে প্রাণচঞ্চল করে রেখেছিলেন। সমসাময়িককালে তাঁদের জনপ্রিয়তা ছিল মধুসূদনের চেয়েও বেশী।

বাংলা গীতিকবিতা ।।

ছোট কবিতা চিরকালই বাঙ্গালীর প্রিয়। মধ্যযুগে বৈষ্ণব পদাবলী শাখার বিস্তার সে কথাই প্রমাণ করে । কিন্তু মধ্যযুগের এই সব কবিতা বা গেয় পদের সঙ্গে আধুনিক গীতিকবিতার অনেক তফাত আছে। আধুনিক গীতিকবিতা গেয় নয়। পাঠ্য। পদাবলীর মত কোনও সুনির্দিষ্ট কাহিনী বা তত্ত্ব নেই। এ কবিতা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। কবির নিজের মন ছাড়া এর অন্য কোনও বিষয় নেই।

আধুনিক বাংলা কবিতার জন্মলগ্ন থেকেই এ ধরণের কবিতা রচিত হতে আরম্ভ করেছিল। সে যুগের মহাকাব্য লেখকেরাই প্রত্যেকে গীতিকবিতাও লিখেছেন। মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে গীতিকবিতা তাঁদের প্রথম ও প্রধান প্রেরণা ছিল না। এবং সেইজন্য গীতিকবিতার উপযোগী ভাবতন্ময়তাও তাঁদের রচনায় নেই।

গীতিকবিতা ঃ বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিকবি বিহারিলাল চক্রবর্তী। শুধু নিসর্গপ্রীতি নয়, জড় প্রকৃতির অন্তরালে একটি প্রাণময় চেতনা সত্তার সঞ্চরণ ও বিচ্ছুরণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই চেতনা একান্তরূপেই রোমান্টিক চেতনা।

বিহারীলালের প্রধান কাব্যগুলি হল-
১৮৬২ - সঙ্গীত শতক
১৮৭০- বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ, সদর্শন, বন্ধুবিয়োগ
১৮৭১ - প্রেমপ্রবাহিনী
১৮৭৯ - সারদা মঙ্গল, সাধের আসন।

তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য সারদামঙ্গল। নিখিল মানবের অন্তরে যে শক্তি প্রেম ও সৌন্দর্য, কণা ও কল্পনা রূপে বিরাজিত আছে তাকেই তিনি দেবী সরস্বতী বা সারদা বলে কল্পনা করেছেন। এই দেবীর নানা যুগে নানা রূপ। একদিকে তিনি যেমন সর্বমানবের আকাঙ্খার ধন, অন্যদিকে তেমনই কবির একান্ত নিজস্ব প্রেম ও ভক্তির আধার। এঁর সঙ্গে তাঁর মিলন বিরহ মান অভিমানের একটি ক াল্পনিক লীলা সারদা মঙ্গলে বর্ণিত হয়েছে। রহস্যময়ী দেবী সারদা। যিনি কবির চিত্তে কাব্যপ্রেরণা। তাঁকে যখন ডাকা হয় তখন পাওয়া যায় না। তিনি যখন আসেন আপনিই আসেন এবং ভক্তকে অগোচরে তাঁর অমৃতস্পর্শ দিয়ে চিরকালের জন্য ধন্য করে যান।

বিহারীলালের সবচেয়ে বড় ত্রুটি আঙ্গিকগত শৈথিল্য। যে সংহতি, ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতময়তা গীতিকবিতার ধর্ম সে ভাষা তখনও গড়ে ওঠেনি । বিহারীলাল নিজের বক্তব্যকে অযথা ফেনায়িত করেছেন বলে পাঠকচিত্তে ঈপ্সিত প্রতিক্রিয়া জাগে না।

গীতিকাব্য ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

ঠাকুরবাড়িতে বিহারীলালের সমাদর ছিল। নিতান্ত বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন সবেমাত্র অক্ষর গুনে গুনে ছন্দ মেলাতে শিখছেন তখন থেকেই তিনি বিহারীলালের ভক্ত। তখনই তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল বিহারীলালের মত কবি হওয়া। ফলে বিহারীলালকে অনুসরণ করেই তাঁর কাব্যরচনার হাতেখড়ি হয়।

নিতান্ত বালক বয়সের অপরিণত রচনার পর যেখান থেকে তাঁর স্বকীয়তা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে সেই কাব্যগ্রন্থগুলি হল —
(১) সন্ধ্যাসংগীত - ১৮৮২
প্রভাত সংগীত - ১৮৮৩
ছবি ও গান - ১৮৮৪
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী - ১৮৮৪
কড়ি ও কোমল - ১৮৮৬
মানসী - - - - ১৮৯০

রবীন্দ্রনাথের নিজের মতে কড়ি ও কোমল থেকে তাঁর " কাব্য ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে" এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের মতে মানসী তাঁর "প্রথম পরিণত শক্তির কাব্য ।" লক্ষণীয় বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথ সেই অল্প বয়সেই নিজের স্বভাব ধর্মটি সঠিক চিনতে পেরেছিলেন। তাই সেকালের প্রচলিত রীতিতে বীর বা কণ রসাত্মক জমকালো কাব্য কাহিনীর দিকে একবারও ঝোঁকেন নি। "অনন্ত এ আকাশের কোলে টলমল মেঘের মাঝার/ এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর তোর তরে কবিতা আমার" - তখন তিনি এইরকম আদ্যন্ত রোমান্টিক।

বাইরের জগৎ সম্পর্কে কোনো সঠিক অভিজ্ঞতা তখনও পর্যন্ত তাঁর হয় নি। এই সময় তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের একটি সিদ্ধান্ত তাঁর জীবনের ধারাটি বদলে দিয়েছিল। রোমান্টিক ভাবুকতা থেকে তিনি উত্তীর্ণ হলেন বৃহত্তর বোধির জগতে। ঘটনাটা এই যে পূর্ববঙ্গে ঠাকুরপরিবারের যে এজমালি জমিদারি ছিল তারই দেখাশোনার ভার পড়ল তাঁর ওপর। পরবর্তী প্রায় দশ বছর তিনি পদ্মা তীরবর্তী শিলাইদহ, শাজাদপুর পতিসর প্রভৃতি গ্রামে বাস করেছিলেন। দূরদূরান্তরের গন্ডগ্রামে ছড়ানো জমিদারি দেখাশোনার জন্য অনেক সময় তিনি বাস করেছেন নৌকায়। শহরের সঙ্গে এই দূর পল্লীগ্রামের তফাত তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে ছিল। পদ্মানদী, নদীমধ্যস্থ চর, তীরে ছবির মত ছোট ছোট গ্রাম, অবারিত আকাশ ও আলো। বিভিন্ন ঋতুতে দিনে রাতে নিত্য পরিবর্তমান প্রকৃতি পট এ সবের গভীর সৌন্দর্য তাঁকে অভিভূত করল। গ্রামবাসী সাধারণ মানুষের ছোট ছোট সুখদুঃখের জীবন তাঁর মনে জাগাল মানুষ সম্পর্কে কৌতূহল ও ভালোবাসা। তাঁর নিজের কথায় এই সময় তাঁর মনে প্রধান হয়ে উঠেছিল দুটি ভাব সুখদুঃখ বিরহ মিলন পূর্ণ সংসারে প্রবেশের আকাঙ্খা ও নিদ্দেশ সৌন্দর্যের আকাঙ্খা । প্রথমটি ব্যক্ত হয়েছে গল্পগুচ্ছে, দ্বিতীয়টি ব্যক্ত হল এই পর্বের কবিতায়। বইগুলি হল—
সোনার তরী - ১৮৯৪
চিত্রা - ১৮৯৬
২য় পর্ব চৈতালি - ১৮৯৬

রবীন্দ্রসাহিত্যে এইটি সবচেয়ে ঐশ্বর্যময় ও ফলবান পর্ব। তাঁর নিজের ভিতরে যে শক্তি আজ জেগে উঠেছে তার গতিপ্রকৃতি তাঁর অজানা। পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসায় তাঁর মন পূর্ণ - এই কথাটিই ঘুরে ফিরে এসেছে ভাষা ছন্দে রঙে ঝলমল করা কাব্যগুচ্ছে।

কবিদের জীবনে একটা ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। তাঁরা যে পরিবেশে জন্মান, যেরকম শিক্ষাদীক্ষা পান, যাঁদের ভালোবাসেন সে সব থেকে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির যোগে তাঁদের মনে লোকের একটা গড়ন তৈরি হয়। তদনুযায়ী মনের মধ্যে যে সব কথা জমে ওঠে তা কয়েক বছর ধরে বলেন। বলা হয়ে যাবার পর তাঁদের আর নতুন কোনো কথা থাকে না । তখন কেউ হয়ে যান গতানুগতিক ও বিবর্ণ কেউ বা কলম থামিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর এক সময়ের জমে ওঠা অনুভূতিগুলি ব্যক্ত হয়ে যাবার পর তিনি সেটা ত্যাগ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্তভূমিতে চলে যেতে পারতেন। এ ঘটনা বার বার ঘটেছে। পুরান কথিত ফিনিক্স পাখীর মত নিজ ভস্মাবশেষ থেকে তিনি বার বার নবজন্ম নিয়েছেন।

দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করতে লাগলেন তাঁর আর কিছু বলার নেই । তবে কি তাঁর কবিজীবন সমাপ্ত হবে? এই সংশয় যখন তাঁকে পীড়িত করছে সেই সময় সহসা ভাবজগতের নূতন একটি দিগন্ত তাঁর সামনে খুলে গেল। প্রাচীন ভারতের কাব্য ও সভ্যতা ধর্মবোধ ও শৌর্যবীর্যের কাহিনীগুলি তাঁর মনে পড়ল। এই সময় তাঁর অতীত ভারতে প্রয়াণের কাল। বইগুলি হল-

কথা ও কাহিনী - ১৯০০
কল্পনা - ১৯০০
নৈবেদ্য - ১৯০১

সমকালে ভিন্নস্বাদের বইও ছিল
ক্ষণিকা - ১৯০০
স্মরণ - ১৯০৩
শিশু - ১৯০৬

জীবনের দুঃখভয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে খোশমেজাজে থাকবার একটা লঘু ভঙ্গী ক্ষণিকার কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য। নিজের সদ্যমাতৃহীন শিশু সন্তানগুলিকে সঙ্গ দিতে দিতে লিখেছিলেন শিশু। স্মরণ তাঁর মৃতা পত্নীর স্মৃতিতে লেখা।

তখন রবীন্দ্রনাথের মধ্য জীবন। এতকাল মোটামুটি মসৃনভাবে তাঁর জীবন কেটেছে। চবিবশ বছর বয়সে বৌঠাকুরানীর মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো বড় শোকও পাননি । এইবার একের পর এক বিপদের আঘাতে তিনি জর্জরিত হতে লাগলেন। স্ত্রী, মেজ মেয়ে, ছোট ছেলে, বাবা ও বড় মেয়ে একে একে মারা গেলেন। এদিকে তখন সবেমাত্র শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। সেখানে যাঁকে সঙ্গে করে কাজ শু করেছিলেন সেই ব্রম্বাবান্ধব উপাধ্যায় চলে গেছেন রাজনীতির জগতে। বিদ্যালয়ে দুই মস্ত বড় সহায় অজিতকুমার চক্রবর্তী ও সতীশ চন্দ্র রায়ের অকালে মৃত্যু হল। চারিদিকে অর্থাভাব। নিন্দুকেরা সরব ও সক্রিয়। এই ব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে তিনি নিজ হৃদয়ে ঈশ্বরের স্পর্শ পেলেন। এই ঈশ্বর কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানগত দেবতা নন। তাঁরই জীবনদেবতা। এই নতুন অধ্যায়ে আকুতি ও সান্ত্বনা প্রকাশ পেল নব পর্যায়ের কবিতায়। বইগুলি হল—

খেয়া - ১৯১০
গীতিমাল্য - ১৯১৪
গীতালি - ১৯১৫
এই পর্বের কবিতা অপেক্ষাকৃত ভূষণ বিহীন। আকারেও ছোট।

১৯১২- ১৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ও আমেরিকায় কিছুদিন থেকে এলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শেষে পেলেন নোবেল পুরস্কার। ক্রমশ ঃ সারা পৃথিবী থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আসতে লাগল। এই সব ঘটনা তাঁর জীবনকে পৌঁছে দিল একঘাট থেকে অন্য এক ঘাটে। জড় বা চেতন কারও বিবর্তন মুহূর্তের জন্য থেমে নেই একথা অনুভব করে তিনি ব্যক্তিগত দুঃখ ক্ষতির কষ্টকে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। দেশে বিদেশে নানা মানুষের নানা ভাবের সাহচর্যে উজ্জীবিত হয়ে অনুভব করলেন প্রেম ও যৌবন শুধু বয়সের ধর্ম নয় তা বয়স নিরপেক্ষ এক শক্তি। এই পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলি হল—

বলাকা - ১৯১৬
পূরবী - ১৯২৫
মহুয়া - ১৯২৯

শেষ জীবনে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ কবিতার রূপপদ্ধতি ও বাক্- নির্মিতির এক নতুন প্রকারভেদ আবিষ্কার করলেন। তা হল গদ্যছন্দ। দার্শনিক চিন্তা ও জীবনের সহজ চলচ্ছবি দুইই গদ্য ছন্দের কবিতাগুলিতে আছে। কয়েক বছর গদ্যছন্দের নানারকম প্রয়োগ নিয়েই তিনি ব্যাপৃত রইলেন। বইগুলি হল —

পুনশ্চ - ১৯৩২
বিচিত্রিতা - ১৯৩৩
শেষ সপ্তক - ১৯৩৫
বীথিকা - ১৯৩৫
পত্রপুট - ১৯৩৬
শ্যামলী - ১৯৩৬
বীথিকা ছাড়া সবগুলিই গদ্যছন্দে লেখা।

এর পর রবীন্দ্রনাথ আবার পদ্যছন্দে ফিরে আসেন। পরবর্তী কবিতাগুলির মধ্যে গদ্য ও পদ্য দুরকম ছন্দই আছে। এখন তাঁর মন শেষ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত। " পুরাতন আমার আপন / পথবৃন্ত ফলের মতন ছিন্ন হয়ে আসিতেছে" এই অনুভূতি তাঁকে এক প্রজ্ঞাদৃষ্টি দান করেছে। প্রধান বইগুলি হল—

প্রান্তিক - ১৯৩৮
সেঁজুতি - ১৯৩৮
আকাশ প্রদীপ - ১৯৩৯
নবজাতক - ১৯৪০
সানাই - ১৯৪০
রোগশয্যায় - ১৯৪০
আরোগ্য - ১৯৪১
জন্মদিন - ১৯৪১
শেষ লেখা - ১৯৪১
আশি বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর মন ছিল সজাগ এবং লেখনী ছিল সক্রিয়। মানসিক স্বাস্থ্যের এ এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত।

গীতিকবিতা ঃ রবীন্দ্রানুসারী কবিগোষ্ঠী

এত দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার চর্চা করেছিলেন যে তাঁর আয়ুষ্কালের মধ্যেই পরবর্তী কবিদের দুটি প্রজন্ম এসে গিয়েছিল। প্রথম প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। এই পর্বের কবিরা শক্তিহীন ছিলেন না। অনেকেই বিচ্ছিন্নভাবে ভালো কবিতা লিখেছেন। কিন্তু কালপ্রবাহে তাঁরা সকলেই হারিয়ে গেলেন। কারণ তাঁরা অন্ধভাবে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছিলেন। কোনো মৌলিক বক্তব্য বা ভঙ্গী তাঁদের ছিল না।

বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় " তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ এবং অসম্ভব ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ।" অনিবার্য এই জন্য যে রবীন্দ্রনাথের চর্চায় বাংলা কবিতার ভাব ও ভাষার ভান্ডারে এত উপকরণ জমে উঠেছিল যে মনে হত কবিতা লেখা নিতান্তই সহজ। অসম্ভব এইজন্য যে রবীন্দ্রনাথের আপাতসহজ কথার পেছনে যে গভীরতা ছিল, দুঃখদহনজাত যে তাপ ও বেগ ছিল তা অননুকরণীয়। ফলে এঁরা সরল গ্রামজীবনের মুগ্ধ চিত্রকর হয়েই রইলেন। এঁদের মধ্যে ছন্দ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন, সাময়িক বিষয় নিয়ে কাব্য রচনাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল। কিন্তু তিনি কানের দাবি মেটাতে যতটা সক্রিয় ছিলেন প্রাণের দাবি মেটাতে ছিলেন ততখানিই উদাসীন। ফলে সমকালে জনপ্রিয় হলেও তাঁর রচনা আজ শূন্যগর্ভ ও ফেনিল বলেই মনে হয় ।

গীতি কবিতা ঃ কাজি নজল ইসলাম (১৮৯৯- ১৯৭৩)

রবীন্দ্রপ্রভাবিত বাংলা কাব্যে নজল একটি সুস্পষ্ট ভিন্ন সুর এনেছিলেন। এঁর জন্য তাঁর জীবন পরিবেশ অনেকখানি দায়ী।

কলকাতা শহর থেকে বহু দূরে রানিগঞ্জ অঞ্চলে দরিদ্র মুসলমান পরিবারে তাঁর জন্ম। শৈশবেই ঘরছাড়া হয়ে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি মানুষ হয়েছেন। মেধাবী ছাত্র ও বহু বিদ্যায় দক্ষ হয়েও প্রথাগত বিদ্যাশিক্ষা তিনি বেশীদুর করতে পারেন নি । কৈশোরে যোগ দিয়েছিলেন সৈন্যদলে । যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে না হলেও সামরিক শিক্ষা তাঁর কিছুটা ছিল। সব মিলিয়ে সমকালের শিক্ষিত মার্জিত শহরবাসী মৃদুভাষী কোমলমতি কবিদের থেকে তিনি ছিলেন একেবারেই আলাদা।

প্রথম যৌবনে তিরিশ বছর বয়স হবার আগেই তাঁর যাবতীয় ভালো কবিতা লেখা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রধান বইগুলি হল অগ্নিবীণা(১৯২২), বিষের বাঁশি, সর্বহারা, ভাঙার গান, দোলন চাঁপা, সিন্ধু হিন্দোল ইত্যাদি। তাঁর কিছু প্রেমের কবিতা আছে। সেগুলি উচ্ছ্বাঃ সময় ও বৈচিত্র্যহীন । যে কবিতায় তাঁর খ্যাতি সেগুলির মধ্যে একটি প্রবল বিদ্রোহের সুর আছে। মানুষের সর্ব-বন্ধন মুক্ত স্বাধীনতার জন্য তাঁর আকাঙ্খা ছিল। সমাজে মানুষে মানুষে অন্যায় ব্যবধানের কারণগুলি, তা অর্থনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় যাই হোক না, ছিল তাঁর তীব্র আক্রমণের লক্ষ্য । তাঁর কবিতা পুরোপুরি বহির্মুখী। সেখানে আত্মানুসন্ধান বা জীবন জিজ্ঞাসা নেই। প্রচলিত মূল্যবোধে তিনি বিশ্বাসী। কেবল মনুষ্যসৃষ্ট অন্যায়ের প্রতি তাঁর প্রবল বিক্ষোভ। প্রাণশক্তির অসংবৃত উচ্ছ্বাসে তিনি লিখে গেছেন। তদনুযায়ী শব্দ ছন্দ চিত্রকল্পও আহরণ করেছেন। এই বিদ্রোহী প্রবলতাই তাঁর অমরত্বের চাবিকাঠি।

গীতিকবিতা ঃ রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠী

এর পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত অন্ততঃ মুক্তির জন্য চেষ্টিত একগুচ্ছ কবি বাংলাসাহিত্যে দেখা দিলেন। এঁরা সকলেই মোটামুটি বিংশ শতাব্দীর সমকালে জন্মেছেন, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে ছাত্রজীবন কাটিয়েছেন, ইংরাজি সহ পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক গতিপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে থাকার সচেতন প্রয়াস সহ বাংলা কবিতার আসরে নেমেছেন। নতুন বিষয় ও ভাষার অনুসন্ধান তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিল বিশেষ কতকগুলি কারণে।

(১) রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুসরণের শোচনীয় দৃষ্টান্ত তাঁরা অগ্রজ কবিকুলের মধ্যে দেখেছিলেন।
(২) প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে অনিশ্চয়তা, অবিশ্বাস ও একাকীত্ববোধের হাওয়া বইছিল তার সঙ্গে তাঁরা পরিচিত ছিলেন।
(৩) বাঙালী জীবনের প্রেক্ষাপটও তখন দ্রুত বদলে যাচ্ছে। গত শতাব্দীতে তার যে নিশ্চিন্ত জীবন ছিল তা আর নেই। তার অর্থনীতি বিপন্ন, রাজনীতি বিক্ষুব্ধ, জীবনসংগ্রাম তীব্র। এই অবস্থায় সত্য শিব সুন্দরে পুরানো বিশ্বাস চলে যেতে বাধ্য।

নতুন গোষ্ঠীর প্রধান কবিরা হলেন—

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯ - ১৯৫৪)
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১- ১৯৬০)
অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১ - ১৯৮৬)
বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮ - ১৯৭৪)
বিষ্ণু দে (১৯০৯ - ১৯৮২)

এঁরা সকলেই অন্তর্মুখী কবি। জগতে সত্যের জয়, ধর্মের জয়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মঙ্গলময়তা বিষয়ে সন্দিহান, একাকীত্ববোধে জর্জর। এঁদের সধ্যে সর্বপ্রধান নিঃসন্দেহে জীবনানন্দ। এখনও পর্যন্ত তিনি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সুররিয়ালিষ্ট কবি। অবচেতন মনোগহন থেকে আশ্চর্য সব চিত্রকল্প তিনি তুলে এনেছেন। তাঁর ভাবপ্রকাশের একটি মন্থর ও নিগূঢ় ভঙ্গী আছে এবং পরবর্তী কবিকুলের অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করেছেন। তাঁর প্রধান বইগুলি হল—

ধূসর পাণ্ডুলিপি - ১৯৩৬
বনলতা সেন - ১৯৪২
মহাপৃথিবী - ১৯৪৪
সাতটি তারার তিমির - ১৯৪৮

অন্যান্য কবিদের প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি হল—

সুধীন্দ্র নাথ দত্ত—
অর্কেস্ট্রা - ১৯৩৫
ক্রন্দসী - ১৯৩৭
উত্তর ফাল্গুনী - ১৯৪০
সংবর্ত - ১৯৫৬

অমিয় চক্রবর্তী—
খসড়া - ১৯৩৮
একমুঠো - ১৯৩৯
পারাপার - ১৯৫৩

বুদ্ধদেব বসু —
বন্দীর বন্দনা - ১৯৩০
কঙ্কাবতী - ১৯৩৭
দময়ন্তী - ১৯৪৩
দ্রৌপদীর শাড়ি - ১৯৪৮
শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর - ১৯৫৫

বিষ্ণু দে —
উর্বশী ও আর্টেমিস - ১৯৩২
চোরাবালি - ১৯৩৮
পূর্বলেখ - ১৯৪০
সন্দীপের চর - ১৯৪৭

নাম রেখেছি কোমল গান্ধার - ১৯৫০

নিজেদের সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য - " আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য প্রচুর— কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুস্তর। দৃশ্যগন্ধস্পর্শময় জীবনানন্দ আর মননপ্রধান অবক্ষয়চেতন সুধীন্দ্রনাথ দুই বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। আবার এ দুজনের কারো সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর এতটুকু মিল নেই। তবু যে এই কবিরা সকলে মিলে একই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত তাঁর কারণ এঁরা নানা দিক থেকে নতুনের স্বাদ এনেছেন। "

এঁদের পরে যাঁরা এসেছেন - প্রবীণ সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে নবীন জয় গোস্বামী পর্যন্ত সংখ্যায় তাঁরা অনেক। তাঁদের মধ্যে ভালো মন্দ মাঝারির শ্রেণীভাগ অবশ্যই আছে। বাংলা কবিতার সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস থেকে তাঁরা এটা বুঝেছেন যে গীতিকবিতার কোনো বিষয় হয় না। কবির কথাটা পাঠকমনে কি অভিঘাত তৈরি করল সেটাই জরি। তার জন্য প্রত্যেকের আলাদা ভাষা চাই। কাব্য কলা উত্তরাধিকার সূত্রে লভ্য নয়। আপন প্রতিভায় উপার্জনীয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ ।।

উন্নত ভাষায় সৃজনশীল সাহিত্যের পাশাপাশি তথ্যভিত্তিক মননশীল নানা প্রকার রচনার একটা ধারা বহমান থাকে। তাদের ঠিক সাহিত্য পরিধির অন্তর্গত করা যায় না বলে সাহিত্যের ইতিহাসে তাদের বিবরণ থাকে না। কিন্তু একটা জাতির চিন্তাভাবনার স্তরটি বুঝতে গেলে এদের সন্ধান রাখানিতান্ত জরি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গদ্য বিভাগে এই ধরণের রচনার একটা বড় ভান্ডার গড়ে উঠেছে। এদের বিশদ বিবরণে না গিয়ে শুধু কি ধরণের রচনা আছে তার যৎসামান্য উল্লেখ করি।

(১) ভ্রমণকাহিনী— উল্লেখযোগ্য লেখকেরা হলেন—
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন, প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার সান্যাল, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
শঙ্কু মহারাজা, সুবোধ কুমার চক্রবর্তী, রানী চন্দ, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি ।

(২) জীবনী সাহিত্য ঃ
বাংলা ভাষায় এই শাখাটি সমৃদ্ধ ও বিশাল । উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই হল —
(ক) শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ - স্বামী সারদানন্দ
(খ) রামকৃষ্ণ কথামৃত - শ্রীম
(গ) রামমোহন রায় - অজিত কুমার চক্রবর্তী
(ঘ) রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ - শিবনাথ শাস্ত্রী
(ঙ) বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ - বিনয় ঘোষ
(চ) বঙ্কিম চন্দ্র জীবনী - অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য
(ছ) আশার ছলনে ভুলি - গোলাম মুরশিদ
(জ) রবীন্দ্র জীবনী - প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
(ঝ) রবিজীবনী - প্রশান্ত কুমার পাল
(ঞ) তীর্থংকর - দিলীপ কুমার রায়
(ট) বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ - শঙ্করী প্রসাদ বসু

(৩) গবেষণা—
সাহিত্য, ললিত কলা, লোকশিল্প, সংগীত, চলচ্চিত্র, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি জ্ঞানরাজ্যের যাবতীয় বিষয়ে বাংলা ভাষার উৎকৃষ্ট গবেষণাগ্রন্থ আছে।
বাংলাভাষায় বিজ্ঞানগবেষণা অপেক্ষাকৃত কম হলেও ইদানীং তার কিছু কিছু চর্চা দেখা যায়। তবে সেগুলি খুব উন্নতমানের নয়। সর্বসাধারণের সহজবোধ্য ।

(৪) অনুবাদ ঃ
মধ্যযুগে আক্ষরিক অনুবাদ হত না। কিন্তু উনবিংশ শতক থেকে আক্ষরিক অনুবাদ হয়ে চলেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অনুবাদ হল—
(ক) মহাভারত - কালিপ্রসন্ন সিংহ
(খ) রামায়ণ - হেরম্ব ভট্টাচার্য
(গ) রামায়ণ ও মহাভারতের সারানুবাদ - রাজশেখর বসু
(ঘ) জাতক - ঈশান চন্দ্র ঘোষ
(ঙ) ইলিয়াড ও অডিসি - সুধাংশু ঘোষ

এছাড়া ইংরাজী থেকে গল্প উপন্যাস ও পাঠ্যপুস্তকের অবিরল অনুবাদ হয়েছে। ইংরাজি ভাষার মারফৎ বিশ্বের অন্য ভাষার, অথবা সরাসরি অনুবাদও বিরল নয় । সম্প্রতি সাহিত্য একাদেমির উদ্যোগে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় লেখা গ্রন্থাদি বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

তবে একটা কথা বলতেই হবে যে বাংলা অনুবাদের ধারাটি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্টই ক্ষীণ। পৃথিবীতে যে সব দেশ উন্নতি করেছে তারা সর্বাগ্রে অনুবাদের দ্বারা পর ভাষার যাবতীয় সম্পদ আপনার করে নিয়ে তবেই করেছে। সে বিষয়ে বাঙালী উদাসীন। উৎকৃষ্ট বাংলা বই অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ও ভারতের বাইরে প্রচার করার বিষয়েও বাঙ্গালী উদাসীন। তাছাড়া মুষ্টিমেয় গুটিকতক উদাহরণ বাদ দিলে বাংলা অনুবাদের গুণগত মানও ভালো নয়। ভালো অনুবাদ ও একধরণের সৃষ্টি। মূলের ওপর দখল এবং নিষ্ঠা এই দুটি জিনিস থাকা চাই। খুবই দুঃখের বিষয় এ সব গুণ যাঁদের আছে তাঁদের সঙ্গে অনুবাদকর্মের যোগাযোগ এখনও আমাদের দেশে হয় নি।

উপসংহার।।ঃ

(১) বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ইতিহাস কিজন্য জানা দরকার তা এইভাবে বুঝিয়েছিলেন—" যেমন ভূস্তর পর্যায়ে ভূমিকম্প, অগ্নি উচ্ছ্বাস, জলপ্লাবন, তুষারসংহতি কালে কালে ভূমিগঠনের ইতিহাস নানা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে এবং বৈজ্ঞানিক সেই লিপি উদ্‌ঘাটন করিয়া বিচিত্র সৃজনশক্তির রহস্যলীলা বিস্ময়ের সহিত পাঠ করেন, তেমনি যে সকল প্রলয়শক্তি ও সৃজনশক্তি অদৃশ্য ভাবে সমাজকে পরিণতি দান করিয়া আসিয়াছে সাহিত্যের স্তরে স্তরে তাহাদের ইতিবৃত্ত আপনি মুদ্রিত হইয়া যায়। সজীবভাবে আমাদের দেশকে আমরা জানিতে পারি।" এই কাজে প্রবৃত্ত হলে দেখা যায় জাতির মনোজীবন কখনও ধীরে কখনও দ্রুতগতিতে অসম পদক্ষেপে চলে। কখনে

া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তা একই রকম থাকে, যেমন ছিল মধ্যযুগে। কখনও বা প্রতি দশকে পালটে যায় যেমন হয়েছে আজ। ঠিক অব্যবহিত বর্তমানে যে অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি সেটা সাহিত্যের পক্ষে সুসময় নয়। আলগা ভাবে চোখ বুলিয়ে গেলেই চলে এমনতর লঘু রচনা অত্যধিক বেড়ে গেছে। অনেক সময়েই বেশ দৃষ্টি নন্দন মোড়কে তা পরিবেশিত হয়। কিন্তু যে বই লেখবার ও পড়বার জন্য নিষ্ঠা ও অবকাশের প্রয়োজন হয় সে বই কমে আসছে। কিছুকাল আগেও শিক্ষিত মানুষের মনের সবচেয়ে বড় খোরাক ছিল বই । এখন তার স্থান নিয়েছে অন্যতর দৃষ্টিগ্রাহ্য গণমাধ্যম। বইমেলার ভিড় যে কথাই বলুক একথা সত্য যে সিরিয়াস বই পড়বার আগ্রহ সাধারণ মানুষের কমে গেছে। হয়ত আমরা আবার একটা যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়েছি। ভাবী কালে তার ইতিহাস লেখা হবে।

(২) একেবারে শেষে কয়েকটি কথা পুনরায় বলা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যে সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল, স্বীকার করতেই হয়, যে তা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। কারণ সংক্ষিপ্ত পরিসরে এযুগের বিশাল সাহিত্য ভান্ডারকে চেনানো যায় না। বিভিন্ন বিভাগে উদাহরণ স্বরূপ যে সব গ্রন্থের নাম করা হয়েছে সেগুলি ছাড়াও উদাহরণযোগ্য গ্রন্থ অনেক আছে। বহুপ্রতিভাশালী লেখকের উল্লেখমাত্রও করা যায় নি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রধান ধারা এবং তাদের যৎকিঞ্চিৎ উদাহরণ দিয়ে অনুরাগী ও সন্ধিৎসু পাঠকের সামনে এ বিষয়ে একটা প্রাথমিক পথনির্দেশ দেওয়া গেছে মাত্র ।

বাংলা সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হল সেখানে একটি গুরুতর অভাব থেকে গেছে - তা হল বর্তমান বাংলাদেশের সাহিত্য। স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের আগে বাংলাভাষী ভূখন্ডএক রাষ্ট্রের অধীন ছিল । কিন্তু স্বাধীনতার পর বাংলাভাষী এক বৃহৎ অঞ্চল প্রথমে পাকিস্তানের অংশ ও পরে বাংলাদেশ নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হয়েছে। সেখানে খুব সম্প্রতি, বিশেষতঃ স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পরে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত চর্চা হচ্ছে। রসসাহিত্য ও গবেষণা দুদিকেই অনেক নতুন প্রতিভা এসেছেন। সেদেশের সাহিত্যের সাম্প্রতিক পরিচয় নানা কারণে আমাদের পক্ষে সহজলভ্য নয় বলে সেখানকার বিষয়ে কোনও আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের অঙ্গীভূত করা যায় নি। কিন্তু তাই বলে সেখানকার সাহিত্য চর্চা আদৌ উপেক্ষণীয় নয় । তাও বাংলাসাহিত্যের মূল ধারার অন্যতম প্রধান শাখা রূপে গণ্য হবার যোগ্য। প্রবন্ধান্তরে সেই আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com